বাংলাদেশ উন্নয়ন সমীক্ষা
খণ্ড ৩৬ বার্ষিক সংখ্যা ১৪২৫

বাংলাদেশে রাখাইন সম্প্রদায়ের জীবন ও জীবিকা

তাজরীন-এ-জাকিয়া*

১। ভূমিকা

পৃথিবীর সকল জাতির বিবর্তনের গুরুত্বপূর্ণ চলক হলো 'অভিবাসন'। নৃবিজ্ঞানীদের মতে, শিকার অর্থনীতির যুগ হতে জীবন ও জীবিকার তাগিদে যাযাবর জনগোষ্ঠীর মধ্যে প্রথম অভিবাসন প্রক্রিয়া শুরু হয়। রাষ্ট্রের উৎপত্তির পর হতে যদিও এক রাষ্ট্র হতে অন্য রাষ্ট্রের অভিবাসন সীমিত হয়ে আসে, তথাপি এ প্রক্রিয়া চলমান। মানুষ স্থায়ীভাবে বসবাসের উদ্দেশ্যে, দৈনন্দিন কাজের সন্ধানে, নিরাপত্তার অভাবে, চাপের মুখে অভিবাসিত হতে বাধ্য হয়, যা অভিবাসনকারীর ব্যক্তিগত, সামাজিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক, ধর্মীয়, জনসংখ্যাতাত্ত্বিক ও মনস্তাত্ত্বিক জীবনকেও প্রভাবিত করে। বস্তুত এর প্রভাব পরিবার, ব্যক্তি, সংঘ, সম্প্রদায় তথা সমাজের প্রতিটি প্রতিষ্ঠানের উপর ক্রিয়াশীল (Hossen 2006:255)। রাখাইনরাও তেমনি বাংলাদেশে অভিবাসনরত একটি নৃগোষ্ঠী, যাদের অধিকাংশের আবাস কক্সবাজারে। ফলস্বরূপ একদিকে তাদের দৈনন্দিন জীবনযাত্রায় পরিবর্তন সূচিত হয়, অন্যদিকে সংযোজিত হয় পরিবর্তিত বৈশ্বিক, আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক প্রেক্ষিত। তাই সঙ্গত কারণে আলোচ্য গবেষণার মূল উদ্দেশ্যে হলো অভিবাসন প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে বাংলাদেশে রাখাইন সম্প্রদায়ের জীবন ও জীবিকার স্বরূপ অনুসন্ধান করা। প্রবন্ধটি মোট ৭টি অংশে বিভক্ত। ভূমিকা এবং তাত্ত্বিক রূপরেখা ও সহায়ক গ্রন্থ পর্যালোচনার পর তৃতীয় অংশে গবেষণা কৌশল ও চতুর্থ অংশে মৌখিক ইতিহাস (Oral History)ও অনানুষ্ঠানিক সাক্ষাৎকার (Informal Interview) এর ভিত্তিতে বাংলাদেশে রাখাইন সম্প্রদায়ের অভিবাসনের ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট ও বিবর্তনের ধারায় রাখাইনরা আসলে কারা অর্থাৎ তাদের পূর্বপুরুষ, সামাজিক, সাংস্কৃতিক পরিচয় এবং বাংলাদেশে ভৌগলিক সীমা পেরিয়ে কখন ও কীভাবে আসল, বৃটিশ উপনিবেশিকতা সময়কাল থেকে বর্তমান পর্যন্ত তাদের অবস্থান কিরূপ তা আলোচনা করা হয়েছে। প্রবন্ধের পঞ্চম অংশে পর্যবেক্ষণ (Observation) এর মাধ্যমে দৈনন্দিন সংস্কৃতি সম্পর্কে (জীবন-আচার) এবং ষষ্ঠ অংশে তাদের ঐতিহ্যবাহী পেশা, পেশাগত বৈচিত্র্যের (জীবিকা) উপর আলোকপাত করা হয়েছে। প্রবন্ধের সবশেষ অংশে স্থান পেয়েছে উপসংহার। উল্লেখ্য, জন্মসূত্রে কক্সবাজারের রাখাইনরা গবেষকের পূর্ব পরিচিত হলেও তথ্যাবলী সন্নিবেশনে বাংলাদেশে বসবাসরত সকল রাখাইনদেরই নির্দেশ করা হয়েছে।

১.২। গবেষণার বিষয়বস্তু

বাংলাদেশে অবস্থানরত বিভিন্ন নৃগোষ্ঠী দীর্ঘকাল ধরে এদেশে বসবাস করলেও অনেকেই নাগরিক মর্যাদা পায়নি। সংখ্যাগরিষ্ঠ ভিন্ন জাতি সত্ত্বা ও ধর্মাবলম্বীদের একচ্ছত্র আধিপত্য ছাড়াও নানা কারণে রাখাইনদের মতো নৃগোষ্ঠীরা তাদের অস্তিত্বকে সুসংহত করতে পারেনি। যার মধ্যে অন্যতম হলো সামাজিক নিরাপত্তার অভাব, সমাজ ও সংস্কৃতির মৌলিকত্ব হারানোর শংকা, ভূমি দখল ইত্যাদি।

*সহকারী অধ্যাপক, নৃবিজ্ঞান বিভাগ, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়, চট্টগ্রাম।

সর্বোপরি ভৌগোলিক ও রাজনৈতিক বিচ্ছিন্নতা তাদের ক্রমাগত প্রান্তিক জনগোষ্ঠীতে পরিণত করেছে। তাই জীবন ও জীবিকার তাগিদে রাখাইন সম্প্রদায়ের মধ্যে অভিবাসিত হওয়ার প্রবণতা দেখা যায়। এই অভিবাসন প্রক্রিয়ার পরিপ্রেক্ষিতে তাদের জীবন-জীবিকার কৌশলে আসে ব্যাপক পরিবর্তন, যা আলোচ্য প্রবন্ধের উদ্দেশ্য সমূহে প্রতিভাত হয়। আলোচ্য প্রবন্ধের উদ্দেশ্য সমূহ হলো: (ক) রাখাইন সম্প্রদায়ের অভিবাসনের ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট ও বিবর্তন (বৃটিশ উপনিবেশিকতা সময়কাল থেকে বর্তমান পর্যন্ত বিভিন্ন সময়ে তাদের অবস্থান কিরূপ ছিল, তাদের অভিবাসনের কারণ ও প্রেক্ষিত) সম্পর্কে জানা; (খ) তাদের দৈনন্দিন সংস্কৃতিতে (জীবন) কীরূপ পরিবর্তন এসেছে এবং কেন, এই পরিবর্তন প্রজন্মান্তরে কীভাবে গৃহীত হচ্ছে এবং সর্বোপরি (গ) পেশার (জীবিকার) স্বরূপ অনুসন্ধান, পেশা পরিবর্তনের কারণ ও প্রভাব সম্পর্কে জানা। পাশাপাশি বাঙ্গালি-রাখাইন সম্পর্কের ধারণা, বিভিন্ন সরকারি ও সাহায্যকারী প্রতিষ্ঠানের ভূমিকা, তাদের নিজস্ব ভাবনা ও উদ্যোগ সম্পর্কে নানাবিধ তথ্যসমূহ প্রবন্ধে উঠে এসেছে। নিজস্ব গোষ্ঠীগত দ্বন্দ্বের পাশাপাশি মূল জনগোষ্ঠীর অবিশ্বাস, পারস্পরিক অসহযোগিতা, দ্বন্দ্ব-সংঘাত, ক্ষমতার প্রভাব প্রভৃতি তাদের অস্তিত্বকে আশংকাজনক করে তুলছে। সামগ্রীকভাবে এই প্রক্রিয়া অব্যাহত থাকায় তাদের অভিবাসিত জীবনধারা গবেষণার বিষয় হিসেবেবে নির্বাচন করা হয়েছে।

২। তাত্ত্বিক রূপরেখা ও সহায়ক গ্রন্থ পর্যালোচনা

২.১। অভিবাসনের ধারণায়ন

Council of European Commission for Democracy Through Law (CDL) (1991:7) এর মতে, Ethnic Group হচ্ছে "ক্ষুদ্র জনগোষ্ঠী যারা মূল ধারার জনগোষ্ঠী থেকে আলাদা এবং যাদের রয়েছে নিজস্ব নৃগোষ্ঠীগত, ধর্মীয়, ভাষাগত সহ অন্যান্য পার্থক্যসূচক বিষয় যা মূলধারার জনগোষ্ঠী থেকে তাদেরকে পৃথক করে। সচেতনভাবে তাদের আচার, প্রথা, ঐতিহ্য ও ভাষা ইত্যাদি রক্ষার প্রয়াস চালায়"। এদিক বিবেচনায় রাখাইন সম্প্রদায় একটি স্বতন্ত্র Ethnic Group যাদের নিজস্ব ভাষা, সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যগত পরিচয় রয়েছে এবং যা অন্যান্যদের হতে তাদের পৃথক করে। Hossen (2006) অনুসারে, "স্থায়ীভাবে বসবাসের উদ্দেশ্যে এক স্থান থেকে অন্য স্থানে যাওয়া হলো অভিবাসন। মানুষ অভিবাসিত হলে ছেড়ে যাওয়া সামাজিক কাঠামো এবং অন্তর্ভুক্ত হওয়া কাঠামো দুটোকেই প্রভাবিত করে যা সামাজিক, অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক পরিবর্তনের কারণ ও ফলাফলগুলোর আন্ত:নির্ভরশীলাতার ভিত্তিতে দেখা যেতে পারে। কেননা অভিবাসনকে সম্পূর্ণ সামাজিক পরিবর্তন প্রক্রিয়ার একটি অংশ হিসেবে ধারণায়িত করা হয়"। এই অভিবাসন প্রক্রিয়া এবং জনমিতিক পরিবর্তন এ দু'টি সম্পর্কযুক্ত প্রপঞ্চ। ঐতিহাসিক প্রক্রিয়ায় রাখাইন সম্প্রদায়ের জনমিতিক পরিবর্তন অভিবাসনের গতি-প্রকৃতি অনুধাবনের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ দিক নির্দেশনা দেয়। ম্যালথাসের সূত্রানুযায়ী, যেখানে স্বাভাবিক গতিতে জনসংখ্যা বাড়ার কথা, সেখানে দ্রুত জনসংখ্যা কমে যাওয়ার কারণ কি? রাখাইনদের জনসংখ্যা কমে যাওয়ার কারণ হলো পরিবার পরিকল্পনা, প্রাকৃতিক দূর্যোগ, নাগরিকত্বের অসহায়ত্ব, অর্থনৈতিক সংকট, কেন্দ্রীয় ও স্থানীয় প্রশাসনের আনুকূল্যহীনতা, শিক্ষা, ভূমি, ধর্মীয় ও সাম্প্রদায়িক সমস্যা ইত্যাদি।

Fredrik Barth (1969) জাতিগত পরিচয়, মূল্যবোধ ও আচার-আচরণ সম্পর্কে নৃবৈজ্ঞানিক দৃষ্টিকোণ হতে আলোচনার ক্ষেত্রে Ethnic Boundary প্রত্যয়টি ব্যবহার করেন, যার মাধ্যমে রাখাইন সম্প্রদায় কীভাবে নিজেদের সামাজিক, সাংস্কৃতিক সীমারেখা রক্ষা করে অন্যান্যদের সাথে কীভাবে মিথস্ক্রিয়ায় যুক্ত হয় তা স্পষ্টতর হয়। তিনি মূলত: Ethnic Boundary সংজ্ঞায়নে নৃগোষ্ঠীর সাংস্কৃতিক ও সামাজিক সীমানা নির্ধারণের উপর জোর দেন যদিও সেখানে ভৌগোলিক সীমানা থাকতে পারে। তাঁর মতে, "the boundaries to which we must give our attention are of course social boundaries, though they may have territorial counterparts" (Barth 1969 : 15). তিনি Ethnic Boundaryকে কয়েকটি বৈশিষ্ট্যের মাধ্যমে দেখিয়েছেন। যেমন:

১. Ethnic Boundary ঐ পরিচয়কে বোঝায় যখন একটি Ethnic group এর সদস্যরা অন্যদের সাথে মিথস্ক্রিয়ায় লিপ্ত হয়, তারা অন্যদের থেকে নিজেদের পৃথক ভাবে বা ভাবতে পারে;

২. Ethnic Boundary শুধুমাত্র আঞ্চলিক গুণ বা পেশাগত সীমানাকে নির্দেশ করে না, কারণ একই পেশার লোক ভিন্ন গ্রুপে Group এ বা বিভিন্ন গ্রুপের লোক একই পেশায় থাকতে পারে;

৩. Ethnic Boundary সামাজিক জীবনকে ব্যক্তির আচরণ ও সামাজিক সম্পর্কের অধিকতর জটিল সম্পর্কের মধ্য দিয়ে প্রভাবিত করে;

Barth তার আলোচনায় দেখিয়েছেন একটি নির্দিষ্ট ভাষার জনগোষ্ঠী ভিন্ন ভিন্ন এলাকায় বসবাস করলেও এক হয়ে Cultural unity তৈরি করে এবং নির্দিষ্ট জায়গায় বসবাসরত অবস্থায় অন্যদের থেকে নিজেদের আলাদা ভাবতে থাকে ও সাংস্কৃতিক সীমারেখা তৈরি করে। তথাপি Common crisis এর সময় এই সাংস্কৃতিক সীমারেখা তাদেরকে একতাবদ্ধ হতে সাহায্য করে এবং যেকোনো মূল্যে সংস্কৃতি রক্ষার চেষ্টা করে। রাখাইনদের ক্ষেত্রেও দেখা যায়, জীবিকার তাগিদে বাংলাদেশের সর্বত্র বিচরণ করলেও নির্দিষ্ট কিছু অঞ্চলেই তাদের বসবাস। নিজস্ব বলয়ে রাখাইনদের সংস্কৃতি চর্চা স্বতন্ত্র অবস্থানের বহিঃপ্রকাশ, যা অন্যদের তুলনায় আলাদা, যার মাধ্যমে নিজ গোষ্ঠীর মধ্যে আন্তঃসম্পর্ক বজায় থাকার পাশাপাশি অন্যান্য জনগোষ্ঠীর সাথেও সৌহার্দপূর্ণ সম্পর্ক গড়ে উঠে। বলা বাহুল্য, এটি Ethnic Boundary প্রত্যয়টির অন্যতম বৈশিষ্ট্য।

এ প্রবন্ধের পঞ্চম অংশে রাখাইন সম্প্রদায়ের দৈনন্দিন জীবনের পাশাপাশি সামাজিক জীবনের জটিল সম্পর্কের নানা দিক তুলে ধরা হয়েছে, যা তাদের ভিন্ন অর্থবোধক স্বতন্ত্র সংস্কৃতি সম্পর্কে ধারনা প্রদান করে। এর মাধ্যমে Cultural unity তৈরিতে এবং Common crisis এর সময়ও একীভূত হতে সহায়তা করে।

২.২ পরিবর্তনশীল রূপরেখা

Mohsin (1997) তাঁর গ্রন্থে পাকিস্তান ও বাংলাদেশ সময়কালে বিভিন্ন নৃগোষ্ঠীর রাজনৈতিক স্বরূপ আলোচনার পাশাপাশি বৃটিশ উপনিবেশিকরা পাকিস্তান রাষ্ট্রে বিভিন্ন নৃগোষ্ঠী সম্পর্কে কী ধরনের নীতিমালা প্রয়োগ করেছিল সে সম্পর্কে আলোচনা করেন। P. Bessaingnet (1958) পার্বত্য

চট্টগ্রামে বসবাসরত ভিন্ন ভিন্ন জাতিসত্ত্বার বিশ্বাস ব্যবস্থাকে কেন্দ্র করে তাদের অর্থনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক জীবনধারার সাধারণ আলোচনা করেন। বাংলাদেশ তৃতীয় বিশ্বের উন্নয়নশীল দেশ[১] হলেও পরিবর্তমান সমাজ ব্যবস্থায় অতীতের ঐতিহ্যবাহী বৈশিষ্ট্য নিয়ে রাখাইনরা আধুনিকায়নে, পরিবর্তনে প্রত্যাশী এবং উন্নয়নের অংশীদার হতে চায়। তারা নিজ সামাজিক অবস্থান থেকে তাদের ঐতিহ্য কিভাবে সংরক্ষণ করছে এবং নানা প্রতিকূল পরিবেশে থেকেও রাষ্ট্রের নাগরিক হিসেবে কি নাগরিক সুবিধা ভোগ করছে তা দেখার বিষয়।

এ প্রসঙ্গে Muhammad Samad (2006) এর The Rakhaines in Bangladesh : Ethnic Origin, Life Livelihood প্রবন্ধ থেকে বাংলাদেশে রাখাইনদের আগমনের পটভূমি, প্রাত্যাহিক জীবনের বিভিন্ন দিক যেমন জন্মোৎসব, ভাষা-শিক্ষা-সংস্কৃতি, ধর্ম, বসতবাড়ি, পোশাক-পরিচ্ছেদ, পেশা, বিভিন্ন ধর্মীয় ও সামাজিক আচার-অনুষ্ঠান, লোকাচার এবং রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক অবস্থার নানা দিক সম্পর্কে ধারণা লাভ করা যায়, যা তাদের অভিবাসিত জীবন ধারা ও জীবিকাকেই নির্দেশ করে। যদিও পটুয়াখালীতে বসবাসরত রাখাইনরাই তার আলোচনায় স্থান পেয়েছে, তথাপি আলোচনায় বাংলাদেশে বসবাসরত সমস্ত রাখাইনদেরই প্রেক্ষিত ও পটভূমি আলোচিত হয়েছে।

উপরোল্লিখিত আলোচনায় রাখাইন সম্প্রদায়ের অভিবাসনের কারণ এবং বর্তমান জীবন ও জীবিকার চিত্র ফুটে উঠে। যদিও প্রচার ও প্রসারের অভাবে তাদের উন্নয়ন গাঁথা, বিপ্লবী কর্মকাণ্ড, সাহসী পদক্ষেপ ইত্যাদি কম গোচরীভূত হওয়ায় আপাতদৃষ্টিতে রাখাইন সমাজ ধীর স্থির, আত্মকেন্দ্রিক মনে হলেও প্রকৃতপক্ষে তা নয় এবং তা আলোচ্য প্রবন্ধে প্রতিভাত হয়েছে।

৩। গবেষণা কৌশল

কক্সবাজার সদর এলাকায় জন্ম ও বেড়ে উঠায় মাঠকর্মের জন্য কক্সবাজার পৌরসভার অধীন দু'টি রাখাইন পাড়াকে বেছে নেয়া হয়েছে । একটি হলো ফুলবাগ সড়কাধীন যেখানে ২০/২৫টি রাখাইন পরিবার বাস করে এবং যাদের প্রায় সবাই উচ্চবিত্ত, মধ্যবিত্ত ও শিক্ষিত। অন্যটি হলো একই মহল্লার পৌরসভা মার্কেটস্থ, যারা মধ্যবিত্ত, নিম্নবিত্ত এবং শিক্ষার দিক দিয়ে তুলনামূলকভাবে পিছিয়ে। ভিন্ন দুটো এলাকা বেছে নেওয়ার কারণ হলো বর্তমান সময়ের আর্থসামাজিক অবস্থা সম্পর্কে তুলনামূলক ধারণা নেয়া, যোগাযোগ ও যাতায়াত ব্যবস্থার সুবিধা, পরিচিত এলাকা হওয়ার কারণে স্বাচ্ছন্দ্যবোধ করা এবং সর্বোপরি মাঠকর্মের পূর্ব অভিজ্ঞতা। ১৪.০৬.২০১৮ তারিখ হতে ৩০.০৬.২০১৮ তারিখ পর্যন্ত মোট পনের দিনে উভয় এলাকার প্রতিটি থেকে ১৫ জন করে মোট ৩০ জনের কাছ থেকে তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে। এছাড়াও মন্দিরের ভান্তে, Rakhaine Development Foundation এবং Rakhaine Buddhist Welfare Association এর সভাপতি ও সদস্যদের সাথেও আলোচনা করা হয়েছে।

মাঠকর্মে ব্যবহৃত গবেষণা কৌশলসমূহ হলো পর্যবেক্ষণ (Observation), মৌখিক ইতিহাস (Oral History) ও অনানুষ্ঠানিক সাক্ষাৎকার (Informal Interview)। পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে

[১] https://bdnews24.com/bangladesh2018 (accessed on 21.12.2018)

গবেষিত জনগোষ্ঠীর দৈনন্দিন জীবনাচরণ তথা গৃহস্থ পরিবারে নারী-পুরুষের সম্পর্ক, শ্রম ঘণ্টার ব্যবহার, অবসর সময়ের কর্মকাণ্ড, পোশাক, ধর্ম,আচার-অনুষ্ঠান, ভাষার ব্যবহার, প্রতিবেশীর সাথে সম্পর্ক, ব্যবহৃত প্রযুক্তিগত সরঞ্জাম, জীবিকা অর্জনের জন্য ব্যবহৃত যন্ত্রপাতি যেমন তাঁত যন্ত্র, চুরুট বানানো, নাপ্পি/হিদল তৈরি প্রভৃতি সম্পর্কে জানার চেষ্টা করা হয়েছে। মৌখিক ইতিহাসের মাধ্যমে তাদের অভিবাসনের অতীত ইতিহাস এবং অনানুষ্ঠানিক সাক্ষাৎকারের মাধ্যমে স্বাধীনতাত্তোর বাংলাদেশে অর্থাৎ বর্তমানে তাদের অভিবাসন প্রক্রিয়া ও সমাজ জীবনের পরিবর্তিত রূপ সম্পর্কে তুলনামূলক চিত্র তুলে ধরার চেষ্টা করা হয়েছে। তবে এক্ষেত্রে গৌণ (secondary) উৎস থেকে প্রাপ্ত তথ্য ও উপাত্তের সহায়তা নেয়া হয়েছে বেশি। পাশাপাশি কেস স্টাডির মাধ্যমেও তথ্য লিপিবদ্ধ করার চেষ্টা করা হয়েছে। এছাড়া আলোচ্য প্রবন্ধটির অধিকাংশ তথ্য ও উপাত্ত বিভিন্ন গৌণ উৎস যেমন- রাখাইনদের নিয়ে প্রকাশিত বিভিন্ন গবেষণা কর্ম যথা: পুস্তক, জার্নাল আর্টিক্যাল, সাময়িকী, জাতীয় ও আন্তর্জাতিক বিভিন্ন গ্রন্থাবলী ইত্যাদি থেকে সংগৃহীত হয়েছে।

৪। রাখাইন সম্প্রদায়ের অভিবাসনের ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট

বাংলাদেশে ১৬৪.৭ মিলিয়ন[২] জনসংখ্যার মধ্যে আড়াই মিলিয়ন জনসংখ্যা হল Ethnic Community (খান ২০০৩ : ১৫)। পরিচিত নৃগোষ্ঠীর সংখ্যা ৪৫, যারা পাহাড়ী, সমতল ও উপকূলীয় অঞ্চলে বসবাস করে। কক্সবাজারের বিভিন্ন অঞ্চল যেমন মহেশখালী, মানিকছড়ি, উখিয়া, টেকনাফ, হ্নীলা, চৌফলদন্ডী, খুরুশকুল, হারবাং ইত্যাদি এলাকায় রাখাইনদের বসবাস। এছাড়াও বৃহত্তর পটুয়াখালী এবং পার্বত্য চট্টগ্রামেও তাদের দেখা যায়। আরাকান বাংলাদেশের সীমান্তবর্তী মিয়ানমারের একটি প্রদেশ হলেও এদেশের সাথে রয়েছে হাজার বছরের যোগসূত্র। সেক্ষেত্রে বাংলাদেশে রাখাইনদের আগমন জানতে হলে তাদের অভিবাসনের ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট আলোচনা করা দরকার।

৪.১। অভিবাসনের কারণ (বৃটিশ শাসনামল ও তৎপূর্ববর্তী অবস্থা)

রাখাইনদের আদি নিবাস মিয়ানমারের অন্তর্গত পেগু শহরে হলেও এদেশে তাদের অভিবাসনের প্রেক্ষাপট ছিল মূলত দুটি।

প্রথমত, খ্রিষ্টীয় নবম শতকে যখন চট্টগ্রাম, কক্সবাজার ও রামু এলাকা আরাকান সাম্রাজ্যভুক্ত ছিলো। দ্বিতীয়ত, ১৭৮৪ সালে বর্মীরাজ বোধপায়ার দ্বারা আরাকান সাম্রাজ্য যখন বিপর্যস্ত হয়ে পড়েছিলো। এ সম্পর্কে নিম্নে বিস্তারিত আলোচনা করা হলো-

১৬৬৬ সালে jsuvr প্রদেশের শাসক ঙাকু ছালা ষড়যন্ত্রের মাধ্যমে আরাকানাধিপতি শ্রী-সুধমমরাজকে হত্যা করে নিজেকে রাজা ঘোষণা করলে অরাজকতা ও বিশৃংখলার সৃষ্টি হয়। মূলত

[২] www.worldmeters.Info/world-population/bangladesh-population/ (accessed on 19.12.2018)

এসময় হতে আরাকানের বিপর্যয় ও পতন শুরু হয়। প্রতিকূল অবস্থা ও অনিশ্চয়তার কারণে আরাকান রাজ সভার প্রধান পরামর্শক লৎ রুন বৌদ্ধ ভিক্ষু বেশ গ্রহণ করে, অগ্গমেধাবী ভিক্ষু নামে ৮০টি পরিবারকে নিয়ে রাজধানী ত্যাগ করেন। পথিমধ্যে বঙ্গোপসাগর ও বাকঁখালী নদীর মোহনায় পথ শ্রান্তি নিবারণে অস্থায়ীভাবে আস্তানা গড়লেও পরবর্তীতে স্থায়ীভাবে বসবাসের সিদ্ধান্ত নেয়। তিনি এলাকাটির নাম রাখেন অং খ্যেং থা, যার অর্থ দাঁড়ায় অং- সাফল্য, খ্যেং-প্রশান্তি এবং থা-সমৃদ্ধি অর্থাৎ নিরূদ্বেগের জায়গা যা বর্তমান কক্সবাজারের প্রাচীন নাম হিসেবে খ্যাত। উক্ত শহরে উ অগ্গামেধা ছারাদো কর্তৃক স্থাপিত 'আগ্গামেধা ক্যাং' টি ইতিহাসের বহু উত্থান-পতনের নীরব সাক্ষী হয়ে এখনও সগৌরবে টিকে আছে। তখন থেকেই তারা এ অঞ্চলে স্থায়ীভাবে বসবাস করতে শুরু করে। এ সময় থেকে ১৭৮৪ সালের আগ পর্যন্ত কোনো আরাকানীয় অভিবাসন পরিলক্ষিত হয়নি (মজিদ ২০০৩: ৪৯)।

দ্বিতীয়ত, ১৭৮৪ সালে পুনরায় রাখাইন প্রেদখল করে নিলে আরাকানীরা দ্বিতীয় দফায় মাতৃভূমি ত্যাগ করা শুরু করে এবং অভিবাসন প্রক্রিয়ায় এদেশের জনগোষ্ঠীতে পরিণত হয় (Soedjatmoko 1971: 48)। বাঙালিদের কাছে রাখাইন হিসেবে পরিচিত হলেও বৃটিশদের কাছে পরিচয় 'আরাকানীজ' হিসেবে। রাখাইনদের দূর্বলতার সুযোগে বর্মীরাজ রাখাইন- প্রে (আরাকান) দখল করলে জীবন রক্ষার তাগিদে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির নিয়ন্ত্রণাধীন অঞ্চলসমূহে আশ্রয় নেয়। এভাবেই কক্সবাজার, পাবর্ত্য চট্টগ্রাম, পটুয়াখালী সহ বিভিন্ন এলাকায় রাখাইনরা ছড়িয়ে পড়ে। ঐতিহাসিকদের তথ্যানুসারে, সে সময় রাখাইন রাজ্য থেকে চলে আসা রাখাইনদের সংখ্যা লাখের কম নয় (Thengrain 2005 : 13)। ১৭৯৯ সালের জুলাই মাসে মি. এইচ কক্স প্রথম ব্যক্তি হিসেবে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি কর্তৃক নিয়োগপ্রাপ্ত হন। তাঁর মতে, ১৭৯৯ সালে ৪০-৫০ হাজার আরাকানী কক্সবাজার জেলায় আগমন করেছিল। বৃটিশ সরকার প্রথমত মানবিক কারণে এবং দ্বিতীয়ত বিরাম অঞ্চলে নতুন জনপদ গড়ে তোলার লক্ষ্যে এই অভিবাসনকারীদের আশ্রয় প্রদান করেন (Hall 1985 : 632)। ১৮১৭ সালে চট্টগ্রামে নিয়োজিত ম্যাজিস্ট্রেট মি. প্যাচেল কর্তৃক বৃটিশ সরকারের নিকট পাঠানো সুপারিশমালার কারণে আরাকানীরা কক্সবাজার শহরে ভাড়া বাড়িকে নিজের বাড়ি মনে করে স্থায়ীভাবে বসবাস শুরু করে এবং পাশাপাশি জমি-জমা ক্রয়ের অধিকারও পেয়ে থাকে (Khan 1823 : 140) । সেই থেকে তারা এ অঞ্চলের আদি বাসিন্দা। চট্টগ্রাম ও পার্বত্য অঞ্চলে অভিবাসনের কারণগুলো ছিল নিম্নরূপ:

- ভৌগলিক দিক থেকে চট্টগ্রামাঞ্চল ছিল আরাকান সন্নিহিত;
- বর্মা নিকট প্রতিবেশী দেশ হলেও আরাকানবাসীদের জন্য তা ছিল শত্রু রাজ্য;
- চট্টগ্রামাঞ্চলের সাথে আরাকানের ছিল ঐতিহাসিক, সাংস্কৃতিক ও অর্থনৈতিক যোগ;
- আরাকান বিদ্রোহ পূর্বকালে চট্টগ্রামের দক্ষিণাঞ্চল ছিল আরাকানী উপনিবেশ (মজিদ ২০০৩: ৫৫);

- চট্টগ্রামে ছিল অপেক্ষাকৃত উৎকৃষ্ট শান্তি ও নিরাপত্তা ব্যবস্থা। "বৃটিশ অধিকৃত ভূখণ্ডে রাজস্ব যুক্তিযুক্ত এবং একজন লোক পরদিন প্রত্যুষে কোনো না কোনো কর্মচারীর আদেশে তার প্রাণদন্ড হবে- এ আশংকা ছাড়াই নিশ্চিন্তে ঘুমাতে পারে"(চক্রবর্তী ১৯৮৪)।
- চট্টগ্রামকে আশ্রয় করে ভবিষ্যতে বর্মীদের কবল থেকে নিজেদের রাজ্য উদ্ধারের জন্য আক্রমণ করা।

উপরোল্লেখিত কারণ ছাড়াও আরাকানীরা চট্টগ্রাম ও পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলে বসতি গড়েছে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির বসতি দানের নীতির কারণে। দু:খজনক হলেও এই অপবাদ নিয়ে জীবনধারণ করতে হয় "রাখাইনরা বহিরাগত বা বিদেশী একটি জনগোষ্ঠীর অংশ" (মজিদ ২০০৩: ৪২)। ১৭৮৪ থেকে ১৮২৪ সাল পর্যন্ত রাখাইন জনগণের জাতীয়তাবাদী আন্দোলন সংঘটিত হয়েছিলো, বর্মার সামন্তরাজ এবং বৃটিশরাজের আগ্রাসী আক্রমণের ফলে এই আন্দোলন নির্মূল হয়ে যায়। আগ্রাসন, বিশ্বাসঘাতকতা, বলপূর্বক ইতিহাস বিকৃতি, বহিরাগত স্বার্থান্বেষী উপনিবেশিক শক্তি সমূহের নির্যাতনের শিকার হয়ে স্বাধীন জনগোষ্ঠী কিভাবে নিশ্চিহ্ন হয়, রাখাইনদের ইতিহাস তারই জ্বলন্ত প্রমাণ।

৪.২। পাকিস্তান শাসনকাল ও বাংলাদেশ স্বাধীনতা পূর্বকাল

নাফ নদীর উভয় তীরে বসবাসরত রাখাইনরা দীর্ঘ ছয় দশক বৃটিশ রাজত্ব প্রত্যক্ষ করেছে। অবশেষে ১৯৪৭ সালের ১৪ আগস্ট পশ্চিম তীরবর্তী জনগোষ্ঠী পূর্ব পাকিস্তানি এবং জাতি-ধর্ম নির্বিশেষে সকলে পূর্ব পাকিস্তানি হিসেবে অভিহিত হলো। অন্যদিকে একই জনগোষ্ঠীর যে অংশটি নাফের পূর্বতীরে বসবাসরত ছিল তারাও প্রত্যক্ষ করলো ইউনিয়ন অব বর্মার জন্ম এবং এখানেও জাতি-ধর্ম নির্বিশেষে সবাই বর্মী নাগরিকে রূপান্তরিত হলো। তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তান এবং বর্মার মধ্যে বাণিজ্যিক লেনদেন বন্ধ হলে স্থানীয় রাখাইনরা আর্থিক অনিশ্চয়তায় নতুন আশ্রয়ের সন্ধান শুরু করলে পুনরায় অভিবাসিত হয়। ১৯৭১ সালে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের জন্ম হলে তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের সকল নাগরিক বাঙালি হিসেবে অভিহিত হতে থাকে এবং সত্তর দশকের মাঝামাঝিতে এসে তারা আবার বাংলাদেশীতে রূপান্তরিত হয়। ১৯৭১ সালে পাকবাহিনী যেভাবে বাঙালি হত্যা করেছিল, তেমনি ১৭৮৪ সালে আগ্রাসী বর্মী শাসকরা রাখাইন নিধন করেছিল। তাই স্বাধীনতার স্বাদ, স্বাধীনতার সুখ, স্বাধীনতার আনন্দ তাদের জানা। আর এ কারণে বাংলাদেশে রাখাইনদের পরিচয় বললে, অহংবোধের সাথে বলে 'আমরা বাংলাদেশী রাখাইন'। অর্থাৎ রাখাইনরা নিজেদেরকে বাংলাদেশী হিসেবে পরিচয় দিতে গর্ববোধ করে, বাংলাকে তারা ধারণ করে, লালন করে। আর এ তাগিদেই ১৯৭১ সালে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে তারাও মহান মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছে, ক্ষতিগ্রস্ত, নির্যাতিত-নিপীড়িত হয়েছে। প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখ্য, মুক্তিযুদ্ধে সবচেয়ে বেশি ক্ষতি হয়েছিল কক্সবাজার জেলার মহেশখালী থানার রাখাইন সম্প্রদায়ের লোকেরা। পাক হানাদার বাহিনী হত্যাযজ্ঞের পাশাপাশি বৌদ্ধ বিহারের নান্দনিক বস্তুগত সংস্কৃতি ৬২টি রৌপ্য মূর্তি লুণ্ঠন করে এবং কয়েকটি শ্বেত পাথরের মূর্তি থেকে গলা ও হাত কেটে নেয় (মংবা ২০১১: ১৪০)। ধ্বংসপ্রাপ্ত মূর্তিগুলো এখনও কালের নীরব সাক্ষী

হিসেবে দাঁড়িয়ে আছে। এসময় অনেক রাখাইন প্রাণভয়ে পুনরায় অভিবাসীত হয়েছে। নিম্নে উল্লেখিত সাল ওয়ারী জনমিতিক পরিবর্তন থেকে রাখাইন সম্প্রদায়ের অভিবাসনের চিত্রটি পরিস্ফুট হয়:

সন ও শাসন পর্ব	কক্সবাজার
১৭৮৪-১৯০০ (বৃটিশ শাসনকাল)	৮৫,০০০ জন (আনুমানিক)
১৯০০-১৯৪৮ (বৃটিশ শাসন ও পাকিস্তান সৃষ্টির পূর্ব মূহুর্ত কাল)	৭০,০০০ জন (আনুমানিক)
১৯৪৮-১৯৯১ (পাকিস্তান শাসন ও বাংলাদেশ স্বাধীনতা উত্তর কাল)	৪৫,০০০ জন (আনুমানিক)
১৯৯১-২০০৪ (বর্তমান)	২১,০০০ জন (আনুমানিক)

তথ্য সূত্রঃ Rakhaine Buddihist Welfare Association, 2007.

সারণি থেকে দেখা যায়, বৃটিশ শাসনকাল ও পাকিস্তান সৃষ্টির পূর্ব পর্যন্ত জনসংখ্যার স্বাভাবিক বৃদ্ধি ঘটলেও পরবর্তীতে রাখাইন জনসংখ্যা ক্রমাগত কমেছে। ১৯৬০, ১৯৬৪, ১৯৬৫ ও ১৯৭০ সালের উপর্যুপরি প্রলয়ংকারী ঘূর্ণিঝড় ও সামুদ্রিক জলোচ্ছ্বাসের ফলে এই অঞ্চলে বহু লোকের প্রাণহানি ঘটে তার মধ্যে রাখাইনদের সংখ্যা ছিল বেশি। কেননা উপকূলবর্তী অঞ্চলগুলোতে তাদের আবাস ছিলো বেশি। এ সময় তাদের আর্থ সামাজিক রূপ সামগ্রীকভাবে পরিবর্তিত হয়েছে, প্রাকৃতিক দূর্যোগের সুযোগে স্বার্থান্বেষী মানুষ রাখাইনদের জমি-জমা অন্যায়ভাবে হস্তগত করেছে, মামলা মোকদ্দমায় জড়িয়ে অনেক নিরীহ লোক স্থাবর-অস্থাবর সম্পত্তি হারিয়ে নিঃস্ব হয়েছে। যে কারণে অধিকাংশ রাখাইন মাতৃভূমি ছেড়েছে পাক সরকারের আমলে (মাঠকর্ম হতে প্রাপ্ত তথ্যানুসারে)। ১৯৫৫-১৯৬৫ সাল পর্যন্ত সুদীর্ঘ দশ বৎসর কৃষি উপযোগী জমিতে লবণাক্ততা বৃদ্ধি, অনাবৃষ্টির ফলে ব্যাপক শস্যহানি এবং ভয়াবহ প্রাকৃতিক দুর্যোগের ফলে রাখাইন অধিবাসীগণ দারুণভাবে অর্থনৈতিক সংকটের সম্মুখীন হয়। এ সময় অনেকে পুরাতন পেশা যেমন কৃষিকাজ, তাঁত ব্যবসা প্রভৃতি ছেড়ে নতুন পেশা যেমন দিন মজুরি, মাছ ধরা, ঠিকাদারী, দোকান ব্যবসা গ্রহণ করে অর্থনৈতিক দূর্দশা লাঘবের চেষ্টা করে, কিন্তু রাখাইনরা নতুন কোনো পেশা গ্রহণ না করে সঞ্চিত অর্থ, সোনা-রূপা, জমি-জমা ও গরু-ছাগল বিক্রি করে উক্ত সমস্যা সমাধানের ব্যর্থ চেষ্টা করে (মজিদ ২০০৩: ২৩)। এই উদ্ভুত পরিস্থিতি মোকাবেলায় অসমর্থ হয়ে অনেক রাখাইন অভিবাসিত হতে বাধ্য হয়। রাখাইনদের জমিজমা সংক্রান্ত সমস্যার নিষ্পত্তিকরণের জন্য সৃষ্ট 'কলোনিজেশন অফিসার' 'রেসিডেন্ট ম্যাজিষ্ট্রেটের পদে রূপান্তরিত করে ক্ষমতা সীমিত করায় উক্ত কার্যালয়ে গিয়ে মামলা মোকদ্দমা নিষ্পত্তির ব্যাপারটি ছিল ব্যয় সাপেক্ষ, কঠিন ও সময় সাপেক্ষ (Jeck 1918: 18)। পাকিস্তান আমলে এ দেশের সঙ্গে ভারত ও বর্মার উষ্ণ সম্পর্ক না থাকায় ১৯৪৭-১৯৭০ সাল পর্যন্ত সুদীর্ঘ তেইশ বছরে এ অঞ্চলে বসবাসকারী রাখাইনদের ব্রহ্মদেশ ও আরাকানে গিয়ে যেমন আত্নীয়-স্বজনের সাথে সাক্ষাৎ ও বৌদ্ধ ধর্মীয় শাস্ত্র অধ্যয়নের কোনো সুযোগ ছিল না, তেমনি ভারতে অবস্থিত তীর্থস্থান বুদ্ধগয়া, রাজগীর, সারানাথ ও কুশীনগর পরিদর্শন করারও সুযোগ ছিল না। এছাড়াও পাকিস্তানকে ইসলামিক রিপাবলিক ঘোষণা, মুসলিম ছাড়া অন্য কোনো ধর্মালম্বীর প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হওয়ার অযোগ্য ঘোষণা, ১৯৬০ ও ১৯৬৪ সালে খুলনা ও নারায়ণগঞ্জে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা সংগঠিত হওয়ার ফলে তাদের মনে দারুণ

প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়। ফলস্বরূপ তাদের জনসংখ্যার এক বিরাট অংশ দেশ ত্যাগ করে। শুধুমাত্র ১৯৬৬ সালেই পটুয়াখালী অঞ্চল হতে ২৩০টি পরিবার বর্মা দেশে চলে গেছে বলে তৎকালীন রেসিডেন্ট ম্যাজিস্ট্রেটের এক প্রতিবেদনে জানা যায় (খান ১৯৭৮: ৭৮)। বলা যায়, যদি কোনো পরিবার এই সময় বাংলাদেশ থেকে বর্মায় গমন করতো তাহলে বর্মী সরকার একজোড়া মহিষ বা গরু, দুই বিঘা জমি, কৃষিকাজের সরঞ্জামাদি ও কিছু নগদ টাকা পয়সা দিয়ে তাদেরকে পূনবার্সিত করার নীতিও গ্রহণ করেছিলো। উল্লেখিত সময়ে অর্থাৎ পূর্ব পাকিস্তানে অধ্যয়নরত রাখাইন ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য স্টাইপেণ্ড, স্কলারশীপ দেয়ার নীতিও বর্মী সরকার গ্রহণ করেছিলো (মজিদ ২০০৩: ২৫)। প্রকৃতপক্ষে বর্মী সরকারের এই অভিবাসন নীতিই এদেশে বসবাসরত রাখাইন জনসমষ্টিকে বর্মায় গমনের জন্য বহুলাংশে উৎসাহিত করেছিল। একই ভাষাভাষী লোকদের মধ্যে বসবাস করার সুযোগ, ধর্ম, আচার-অনুষ্ঠান করার অবাধ স্বাধীনতা ও সামাজিক নিরাপত্তা বোধ একদিকে তাদের যেমন বর্মায় গমনের জন্য উৎসাহ যুগিয়েছিলো, অন্যদিকে তেমনি পাকিস্তান সরকারের প্রতিক্রিয়াশীল নীতি তাদেরকে এ দেশে বসবাসের জন্য নিরূৎসাহিত করেছিল।

৪.৩। বাংলাদেশ স্বাধীনতা উত্তরকাল

১৯৭১ সালে অনেক রাখাইন মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন যাদের নাম ইতিহাসের পাতায় লেখা নেই। মুক্তিযোদ্ধা উ-মংয়াইন, প্রয়াত কাষ্টমস্ অফিসার উ-ক্যাহ্লাচিং, পটুখালী ও বরগুনা অঞ্চলের কৃষিবিদ উসিটমং প্রমুখের নাম উল্লেখযোগ্য। রাখাইন মুক্তিযোদ্ধাদের মধ্যে রামু উপজেলার রশিদ নগর ইউনিয়নের বিলুপ্ত রাখাইন পাড়ার ছে-ঘ্রি:' নিবাসী মংয়াইন ও মহেশখালীর মংহ্লা সরকারি তালিকাভুক্ত মুক্তিযোদ্ধা (মংবা ২০০৩ : ২০৩)। অনেকেই মুক্তিযোদ্ধা হিসেবে তালিকাভুক্ত হয়ে সনদ অর্জন করতে পারেননি। যারা সরাসরি মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করেনি তারা মুক্তিযোদ্ধাদের আশ্রয় দান, খাদ্য সরবরাহ, টেকনাফ সীমান্ত দিয়ে নারী-পুরুষদের নৌকা যোগে ভারত পাঠানোর ব্যবস্থা প্রভৃতির মাধ্যমে দু:সাহসিকতার পরিচয় দেয়। প্রাণের ভয়ে যেসব রাখাইন বর্মায় চলে গিয়েছিল তাদের অনেকে স্বাধীন বাংলাদেশে পুনরায় ফিরে আসে। বাংলাদেশ সরকার তখন বিভিন্ন অঞ্চলের সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের উন্নতির জন্য 'মাইনরিটি সেল' গঠন করে। এই দফতরের কর্মসূচির অন্তর্ভুক্ত ছিল সংখ্যালঘু বসবাসকারি এলাকায় উন্নয়ন, শান্তি শৃংখলার অবনতি রোধ, সংস্কৃতির পুনরূজ্জীবন ও শিক্ষার প্রসার। এই পরিকল্পনা কার্যকর করার জন্য একজন ম্যাজিস্ট্রেটও নিযুক্ত করা হয়েছিল যার পদবী ছিল 'ওয়েলফেয়ার অফিসার'। সংখ্যালঘু এলাকা পরিদর্শন করে তাদের মধ্যে সরকারের নীতি ব্যাখ্যা করা এবং তাদের অভাব অভিযোগ সরকারের গোচরীভূত করা তার অন্যতম দায়িত্ব ছিল (খান ২০০৩ :২৭)।

কিন্তু সরকারের এই প্রশংসনীয় উদ্যোগের পথে প্রধান প্রতিবন্ধকতা ছিল ওয়েলফেয়ার হেডকোয়ার্টার হতে রাখাইন এলাকাগুলো ছিলো দূরবর্তী, প্রায় যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন। রাখাইনদের ভাষা, ধর্ম, সামাজিক রীতি-নীতি সম্পর্কে সম্যক জ্ঞানের অপর্যাপ্ততার কারণে উন্নয়ন প্রকল্পগুলো বাস্তবায়িত হয়নি। প্রসঙ্গক্রমে, ১৯৭৬-১৯৭৯ সালের জুন পর্যন্ত সরকার কর্তৃক বৌদ্ধদের জন্য ৫,৫৫,৯১৭.০০ টাকার ১১টি প্রকল্প গ্রহণ করা হয়, যার মধ্যে রাস্তাঘাট মেরামত, পুকুর সংস্কার ও তাঁত শিল্পের উন্নয়ন অন্তর্ভুক্ত ছিলো (খান ২০০৩ : ২৭)। যদিও কোনো প্রকল্পই সুষ্ঠুভাবে বাস্তবায়িত হয়নি। দেশ স্বাধীন হবার পরও তাদের উপর লুণ্ঠন, অত্যাচার বন্ধ হয়নি। তবে ১৯৪৬-৪৭ সালের মতো খুন, জখম,

দাঙ্গা-হাঙ্গামা, কিংবা দল বেঁধে ঘরে আগুন দেয়া বা লুঠতরাজের মতো সূত্রাকারে 'cude form'(মজিদ ২০০৩: ১৪৯) এ অত্যাচার করা হয় না। তার পরিবর্তে অন্যভাবে সূক্ষ্ম কৌশলের মাধ্যমে সর্বস্বান্ত হয়। ফলে সব হারিয়ে তারা দেশ ত্যাগে বাধ্য হয়।

নানামুখী সমস্যা মোকাবেলা করে বাঙালিদের পাশাপাশি রাখাইনরাও এদেশে সুন্দরভাবে বসবাস করতে তৎপর। তাই পূর্বের মতো (১৭৮৪-২০০৪ সাল) অভিবাসিত জীবনধারা বর্তমানে অনেক কমে আসছে। কারণ হিসেবে তারা মনে করে মিয়ানমার ও বাংলাদেশে এধরনের কম বেশি সমস্যা থাকলেও বর্তমানে দু'দেশের মধ্যে তুলনামূলকভাবে বাংলাদেশই বসবাসের জন্য উত্তম।

৫। সাম্প্রতিক সময়ে রাখাইন সম্প্রদায়ের অভিযোজন প্রক্রিয়া ও দৈনন্দিন জীবনের সংস্কৃতি

মাঠকর্ম হতে প্রাপ্ত তথ্যানুসারে, বর্তমানে রাখাইনদের মধ্যে অভিবাসন প্রক্রিয়া ত্বরান্বিত হয় না, বাংলাদেশে থাকতেই বেশি স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করে। ফলে বাঙালি সংস্কৃতির প্রভাব, শিক্ষা, শিল্পায়ন ও নগরায়ন, স্যাটেলাইট ও উন্নত তথ্য প্রযুক্তির প্রভাব প্রভৃতির কারণে তাদের ব্যবহারিক ও দৈনন্দিন জীবনে ব্যাপক পরিবর্তন সাধিত হচ্ছে যার ইতিবাচক ও নেতিবাচক প্রভাব কেবল তাদের সংস্কৃতির উপর পড়ছে না, অধিকন্তু তাদের জীবন-জীবিকার উপরও প্রভাব ফেলছে। কক্সবাজার শহরে রাখাইন জনগোষ্ঠীর অভিযোজন প্রক্রিয়া ও দৈনন্দিন জীবনের সংস্কৃতি সম্পর্কে নিম্নে আলোচনা করা হলো:

৫.১। অভিযোজন প্রক্রিয়া

প্রতিকূল পরিস্থিতি মোকাবেলা করে কক্সবাজার উপকূলবর্তী খুরুশকুল, চৌফলদন্ডী, ভারুয়াখালী, রামু থানার ফতেখাঁরকুল, পানেরছড়া, ঈদগড় বৈদ্যপাড়া, টেকনাফ থানার সদর এলাকা ছাড়া খারাংখালী, চৌধুরী পাড়া, মহেশখালীর গোরকঘাটা, ছোট মহেশখালী, মুদির ছড়া, বলিসং, চকরিয়া হারবাং, ঘোনা, মানিকপুর, পেকুয়ার বারবাকিয়া ইত্যাদি এলাকায় রাখাইনরা বসবাস করে। এছাড়া বিভিন্ন সুযোগ-সুবিধা যেমন: ছেলে-মেয়েদের লেখাপড়া, কর্মসংস্থান, নাগরিক সুবিধা, উন্নত জীবন যাত্রা, সামাজিক, সাংস্কৃতিক অর্থনৈতিক ও প্রযুক্তিগত সুবিধা লাভের আশায় কক্সবাজার সদরের (রাখাইন রাজধানী) বিভিন্ন এলাকা যেমন এন্ডারসন রোড, বড় বাজার, মাছ বাজার, আইবিপি রোড, চাউল বাজার, টেকপাড়া, প্রধান সড়ক, বাজারঘাটা, বার্মিজ স্কুল রোড, ক্যাং পাড়া, গোলদীঘির পাড় ইত্যাদি এলাকায়ও স্থায়ীভাবে বসবাস করছে। তবে অভিবাসিত হওয়ার কারণ ও অভিযোজন প্রক্রিয়ার কৌশল সম্পর্কে বর্তমানে তারা ভিন্ন মত প্রকাশ করে। তাদের মধ্যে শিক্ষা বঞ্চিতরা নিজেদের অধিকার সম্পর্কে সচেতন না হওয়া, বঞ্চিত ও অবহেলিত হচ্ছে তা বুঝতে পারে না বললেই চলে। বৃহৎ বাঙালি সমাজে অভিযোজনের ক্ষেত্রে নানা সমস্যার সম্মুখীন হতে হয় যা স্বাভাবিকভাবে মেনে নেয়ার একটা প্রবণতাও তাদের মধ্যে পরিলক্ষিত হয়। বস্তুত নিজেদের সীমাবদ্ধতারও কথা চিন্তা করে বাঙালি সমাজ সংস্কৃতির প্রতি সম্মান দেখিয়ে এবং নিরবে নিজেদের আচার-অনুষ্ঠান পালন করে সমাজের অন্যান্য মানুষের সাথে নিজেদেরকে খাপ খাইয়ে নেয়। বর্তমানে কক্সবাজার অঞ্চলে সুন্দরভাবে বসবাসের জন্য তারা 'নির্বাক' থাকাটাকে অভিযোজনের জন্য অনুকূল মনে করে। কারণ 'নির্বাক' থাকলে কোনো ধরনের ঝুটঝামেলা বা সমস্যা পোহাতে হয় না। এছাড়া সংখ্যাগরিষ্ঠ বাঙালি সমাজে অভিযোজনের জন্য বিশেষ কোনো কৌশল তারা অবলম্বন করে না। কেননা দৈনন্দিন জীবনে

সামগ্রীক চাহিদা অনেকাংশে পূরণ হচ্ছে এটাকেই তারা বড় প্রাপ্তি হিসেবে দেখে। কক্সবাজার জেলার বিভিন্ন থানায় আদিবাসীদের সংখ্যা নিম্নের সারণিতে উপস্থাপন করা হলো:

থানা	মোট জনসংখ্যা	আদিবাসী পুরুষ	আদিবাসী মহিলা	মোট	বাড়ির সংখ্যা	মন্তব্য
কক্সবাজার সদর	৩.৪৮,০৭৫	২,৭৯৯	২,৯৭৬	৫,৭৭৫	-	রাখাইন
রামু	২,০৪,০৮০	৩০০	২৪৫	৫৪৫	৯৫	রাখাইন
মহেশখালী	২,৫৬,৫৪৬	২,৬০৪	২,৯৪৫	৫,৫৪৯	৫৩৫	রাখাইন
চকরিয়া	৩,৬২,২০৪	১,৩৮৫	১,১৮০	২,৫৬৫	৪৫৪	রাখাইন
পেকুয়া	২,০১,১৬০	১৭৫	১৯২	৩৬৭	৩৯	রাখাইন
উখিয়া	১,৫৫,১৮৭	১,৩৮০	১,৩৫৫	২,৬৩৫	৩৪৫	রাখাইন
টেকনাফ	২,০০,৯৮০	৪,৩৬০	৬,০২০	১০,৩৮০	৮৮২	রাখাইন-৫,২৭০, চাকমা-৫,১১০
মোট		১২,৮০৮	১৪,৮৮২			

তথ্য সূত্র: মংবা ২০১১, পৃ:১২০।

বাঙালি সংস্কৃতির প্রভাবে নানা ধরনের ইতিবাচক ও নেতিবাচক প্রভাব তাদের সংস্কৃতির উপর পড়ছে।

৫.২। দৈনন্দিন জীবনের সংস্কৃতি

রাখাইনদের বস্তুগত সম্পদ

তাঁত কাজের জন্য নির্মিত রাখাইনদের বসতবাড়িগুলো কাঠ ও বাঁশের তৈরি দ্বিতল বিশিষ্ট হলেও বর্তমানে যুগোপযোগী বাড়ি নির্মাণ করায় বাসস্থানের কাঠামোগত পরিবর্তন ঘটছে। ঘরের দেয়ালে মূর্তি, ধর্মীয় ও সংস্কৃতির চিত্রের পরিবর্তে প্রাকৃতিক দৃশ্যের পোস্টার, Wall mate, রাজনৈতিক দলের নেতা, মিডিয়া জগতের প্রিয় তারকা, মহান ব্যক্তির ছবি ও বিভিন্ন ধরনের পোট্রেট লাগানো হচ্ছে, যা নান্দনিক সৌন্দর্যের পাশাপাশি রুচি ও মর্যাদার পরিচায়ক। রাখাইনরা তাদের প্রধান খাদ্য ভাতের সাথে সামুদ্রিক মাছ (যেমন-কাঁকড়া, সিঁসিলী (রেক্রাতি), শামুক, ঝিনুক এবং মিঠে পানির মাছের পাশাপাশি বিভিন্ন প্রাণীর (যেমন পোষা ও বন্য শুকর, হরিণ, মুরগী, কবুতর, হাঁস, ব্যাঙ) মাংস খেতে পছন্দ করে। এছাড়া শাকসবজি, ফলমূল, বাঁশ কোড়ল, বুনো ওল, মাশরুম, নাপ্পি বা সিদেঁলি, বিন্নী ভাত, পিঠে-পুলি ইত্যাদি খেয়ে থাকে। নারী ও পুরুষরা নিজ হাতে বানানো চুরুট পান করে। প্রতিকূল পরিবেশ পরিস্থিতি ও খাদ্য দ্রব্যের অপ্রতুলতার কারণে বর্তমানে এসব খাদ্যাভাসে পরিবর্তন এসেছে। উদাহরণস্বরূপ ওয়ান্নে (ছদ্মনাম) নামের মহিলার সংসারে মা মেয়ে দু'জনই কর্মজীবি। ভাড়া বাড়িতে বসবাসরত অবস্থায় খাবারের কারণে 'কালো মগ' সহ অনেক তিরস্কারমূলক কথা শুনতে হয়, যদিও তারা নিজেদের রাখাইন পরিচয় দিতেই বেশি স্বাচ্ছন্দবোধ করে। ঘরোয়া পরিবেশে নিজেদের ধর্মীয় আচার অনুষ্ঠান পালনের সময়ও অনেক সময় এরূপ বাধা আসে। তবে তারা এ নিয়ে কোনো ধরনের প্রতিবাদ করে না। কারণ তারা আচার-অনুষ্ঠান দলগতভাবে মন্দিরেই সম্পন্ন করে। বস্তুগত সংস্কৃতির অন্যতম উদাহরণ হলো পোশাক পরিচ্ছদ।

পোশাক পরিচ্ছদ

পোশাকের ক্ষেত্রে রাখাইন যুবকরা নিজেদের তৈরি লুঙ্গি (দোয়া), শার্ট (এনজ্যি) পরিধান করে। মন্দিরে প্রার্থনা এবং বিভিন্ন ধর্মীয় ও লোকজ অনুষ্ঠানে মাথায় পাগড়ি পড়ে, যা ঐতিহ্যের প্রতীক। অন্যদিকে মেয়েরা লুঙ্গি (থাবিং), ব্লাউজ (বেদাই-এনজ্যি), বক্ষবন্ধনী (রানজেই এনজ্যি), ওড়না (পোছো পেইন) ইত্যাদি পরিধান করে। এছাড়া সাজসজ্জায় চুলে তাজা ফুল, সোনা, রূপার টংকার, স্বর্ণের অলংকার পছন্দ করে। কিন্তু বর্তমানে চাকুরীজনিত কারণে নারী পুরুষ উভয়ে অফিসিয়াল পোশাক পরে, কম সংখ্যক মহিলা তাদের পোশাক পরে, কেননা সালোয়ার কামিজে তারা বেশি স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করে। তবে ধর্মীয় উৎসব, পূজা পার্বনে 'জাতীয় পোশাক' পরে। মেয়েরা চিনজুক নাডং (কানের দুল), পায়ে ক্যাখাং (খাড়ু, নূপুর), হাতে লক্কাউ (চুড়ি)ও লাকচোয়াই (আংটি), স্বৈক্রো, বায়েট (গলার চেইন, নেকলেস) পরিধান করে। পুরুষরা কেবল স্বৈক্রো (গলায় মালা বা চেইন) ও লাকচোয়াই (আংটি) পরিধান করে। অনেক বাঙালি রাখাইনদের পোশাক পছন্দ করে। বর্তমানে বুটিক সপগুলো তাঁত ব্যবহার করে রাখাইনদের এতিহ্যবাহী ধারা বজায় রেখে বিভিন্ন পোশাক বিক্রি করছে। রাখাইন মেয়েরা জিন্স প্যান্ট, গেঞ্জি, ফতুয়া ইত্যাদি পরিধান করে। কারণ রাখাইনরা বাঙালি সংস্কৃতির পাশাপাশি নগর জীবন ও স্যাটেলাইট চ্যানেল দ্বারা প্রভাবিত হচ্ছে, যা তাদের মূল্যবোধের বিকাশ সাধনে সহায়তা করে।

রাখাইন মূল্যবোধ

রাখাইন সম্প্রদায়ের মূল্যবোধ ও মনোবৃত্তিতে অদৃষ্টবাদী ভাবনা, স্বজাত্যবোধ পরিলক্ষিত হয়। যেমন- গ্রামাঞ্চলে শিশু মৃত্যুকে মনে করে 'সে যে বেড়ে উঠবে না, এ ছিল ভাগ্যের লিখন' এবং সুস্থ হয়ে উঠলে 'দেখ, চিকিৎসা ছাড়াই ভাল হয়ে উঠেছে, তার ভাগ্যে ছিল'। এছাড়া অসুস্থ হলে মন্ত্রের ব্যবহার, ধর্মীয় ভিক্ষুর মাধ্যমে সুস্থতা লাভ করা যায় ইত্যাদি প্রচলিত বিশ্বাস লক্ষ করা যায়। একটি প্রচলিত ধারণা এই যে, "রাখাইন অধ্যুষিত অঞ্চলের চারদিকে বাঁধ বা ভেড়ি নির্মিত হলে, নদীগুলো ভরাট হলে এবং আরাকান ভূখণ্ড থেকে এই অঞ্চলে আগমনের দুইশত বছর (১৭৮৫-১৯৮৫) পূর্ণ হলে এই এলাকায় বসবাস করা উচিত হবে না"। তাদের মধ্যে স্বজাত্যবোধ প্রবল হলেও বর্তমানে তারা প্রচলিত সংস্কার থেকে বেরিয়ে এসেছে।। তাদের জীবনে এসব পরিবর্তনের মূল প্রভাবক হলো শিক্ষা। দেখা যাচ্ছে, অসুস্থ হলে বৌদ্ধ ভিক্ষু, মন্ত্রতন্ত্রের পরিবর্তে ডাক্তারী পরামর্শের উপর নির্ভরশীল হয়েছে। তা সত্ত্বেও সমাজের প্রতিটি মানুষের সচেতন বা অবচেতন মনে পবিত্র-অপবিত্র, শুভ-অশুভ, মঙ্গল-অমঙ্গল, পার্থিব-অপার্থিব বোধ বিরাজ করে। যার কারণে মানুষ নিজস্ব আবর্ত থেকে অনেক সময় বের হয়ে আসতে পারে, আবার অনেক সময় পারে না। তা সত্ত্বেও যুগের সাথে তাল মিলিয়ে চলার কারণে তাদের জীবনে সবকিছুর পরিবর্তন দ্রুততার সাথে হচ্ছে। আর প্রয়োজনের তাগিদে এ পরিবর্তনের সাথে নিজেদের মানিয়ে নেয়ার চেষ্টা করে চলেছে প্রতিনিয়ত। এসব কারণেই প্রতিযোগিতামূলক বাজারে নিজেদের অবস্থান সম্পর্কে সচেতন হওয়ায় গ্রামাঞ্চলের রাখাইনরাও কর্মদক্ষতা ও মর্যাদা সম্পর্কে সচেতন হচ্ছে।তবে ভাষা এক্ষেত্রে অনেক সময় একটি গুরুত্বপূর্ণ বাধা হিসেবে বিবেচিত হয়।

ভাষা চর্চা

রাখাইনরা স্বকীয় সংস্কৃতি ও ভাষার উত্তরাধিকার নিয়ে বাংলাদেশে বসতি গড়ে তোলে। নিজস্ব ভাষা শিক্ষার প্রাথমিক পর্ব পরিবার হলেও লিখিত ভাষা শিক্ষার প্রাথমিক আনুষ্ঠানিকতা শুরু হয় বৌদ্ধ মন্দির অথবা রাখাইন শিশুনিকেতনে। বৃটিশ শাসনামল হতে স্বাধীনতাত্তোর বঙ্গবন্ধু শাসনামল পর্যন্ত কক্সবাজার জেলায় স্থাপিত রামু খিজারী সহ হারবাং, টেকনাফ বার্মিজ সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় গুলোতে বাংলা ও ইংরেজির পাশাপাশি চতুর্থ শ্রেণী পর্যন্ত রাখাইন ভাষা শিক্ষার ব্যবস্থা থাকায় নিজেদের ভাষায় শিক্ষিত হবার প্রবণতা পরিলক্ষিত হতো। কেননা তখন দলিলাদি সহ সমস্ত প্রয়োজনে রাখাইন ভাষায় সহি প্রদানের অধিকার প্রচলন ছিল। কিন্তু স্বাধীনতাত্তোর পরবর্তী সময়ে বার্মিজ সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়সমূহে এ ব্যবস্থা তুলে দেয়ায় ভাষা শিক্ষার পথ বন্ধ হয়ে যায়। শুধু তাই নয়, দলিল সম্পাদন, পাসপোর্ট সহ সকল ক্ষেত্রে রাখাইন বর্ণমালায় স্বাক্ষর দানে নিরুৎসাহিত করা হয়। এভাবে স্বশিক্ষিত একটি সম্প্রদায়কে জাতীয়ভাবে শিক্ষাবর্জিত করে দেয়া এবং স্বাক্ষরের বদলে টিপ সহি প্রদানে বাধ্য করা হলে বাংলা মাধ্যম স্কুলগুলোতে পড়ার আগ্রহ হারিয়ে ফেলে। ফলস্বরূপ অধিকাংশ রাখাইন বিশেষ করে বর্তমান প্রজন্ম রাখাইন ভাষা বলতে জানলেও লিখতে ও পড়তে জানে না। তাই রাখাইন ভাষা ও সাহিত্য আজ অস্তিত্ব সংকটে। বর্তমানে অভিভাবকরা সচেতন হওয়ায় ছেলেমেয়েদের বাংলা মাধ্যমে স্কুলে পাঠাতে বাধ্য হচ্ছে। ফলে একদিকে বাংলা ভাষা শিক্ষায় রাখাইন ছেলেমেয়ে এগিয়ে আসছে, অন্যদিকে প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষা শেষে কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়ন করছে। এক্ষেত্রে ইঞ্জিনিয়ার মংক্যথ্রাইনের ব্যক্তিগত উদ্যোগে ২০০৫ সাল থেকে Rakhaine Students Development Scholarship Program Performance Award চালু হয়েছে। পাশাপাশি বিভিন্ন রাখাইন সংগঠন যেমন Rakhaine Buddhist Welfare Association রাখাইন শিক্ষা তহবিল, উচ্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে অধ্যয়নরত শিক্ষার্থীদের জন্য বৃত্তি প্রদান, বছরে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান যেমন- হারবাং রাখাইন আদর্শ বিদ্যালয় ও হারবাং ইউনিয়ন গার্লস স্কুল, উ-কোসল্যা বৌদ্ধ বিহার ইত্যাদি চালু রাখার ব্যবস্থা করেছে। বর্তমান প্রজন্ম তাদের পূর্বসূরীদের ভাষা শিক্ষায় আগ্রহী হয়ে উঠেছে। তাই স্বউদ্যোগে হলেও বাংলা ভাষা শিক্ষার পাশাপাশি নিজেদের মাতৃভাষার নিয়মিত চর্চা অব্যাহত রেখেছে। এক্ষেত্রে উ-আমেসে এবং উ-মংবাচিনের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের নাম উল্লেখযোগ্য। এছাড়া ওয়ার্ল্ড ভিশন, বাংলা জার্মান সম্প্রীতি ইত্যাদি বেসরকারি সংস্থা পণ্যের মান উন্নয়নের জন্য বিশেষ প্রশিক্ষণ কার্যক্রম পরিচালনা করে থাকে।

কেস স্টাডি-১: রাখাইন মেয়ে এমি (ছদ্ম নাম) চট্রগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাজবিজ্ঞানের ছাত্রী। তার বাড়ি কক্সবাজার (ঙা ইং ফালংসেইমা)। তার মতে, অভিভাবকদের সচেতনতার কারণে বর্তমানে রাখাইনরা শিক্ষার ক্ষেত্রে অনেক বেশি এগিয়ে। কক্সবাজারের অনেকে উচ্চপদে অধীন এবং রামুর ৮ জন ব্যক্তি ডক্টরেট ডিগ্রিধারী। বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে বাঙালিদের সাথে প্রতিযোগিতার কারণে বাংলা ভাষায় পারদর্শী হলেও নিজ ভাষায় ধর্মীয় অনুশাসন (প্যো), নীতিকথা (রাদু),কল্পকাহিনী (লাংকা) ইত্যাদি চর্চা অব্যাহত রাখে। এমির মতো অনেকেই নিজ এলাকার বর্ণমালা লিখতে জানে না। তবে গুরুত্ব উপলব্ধি করে ভবিষ্যৎ প্রজন্মের কথা ভেবে ক্যাথিঅং, উসিটমং, মংক্যাথা, মংবা প্রমুখ রাখাইন

ভাষায় লেখালেখি করেন । রাখাইন সম্প্রদায় তাদের নিজস্ব ভাষা শিক্ষার অধিকার সরকারিভাবে ফিরে পাওয়ার চিন্তা করছে। এ ব্যাপারে বিগত সরকারের কাছে রাখাইনদের প্রস্তাবনা ছিল:

- রাখাইন ভাষা শিক্ষাকে মাধ্যমিক স্তর পর্যন্ত জাতীয় পাঠ্য সূচিতে অন্তর্ভূক্ত করা;
- যে সব বিদ্যালয়ে কমপক্ষে ৫ জন রাখাইন শিক্ষার্থী রয়েছে, সে সব বিদ্যালয়ে রাখাইন ভাষা শিক্ষার ব্যবস্থা নেয়া;
- প্রাচীন রাখাইন সাহিত্য কর্মকে ভাষান্তরের মাধ্যমে সবার নিকট পরিচিত করা;
- সব ধরনের চুক্তি, দলিল সম্পাদন, ব্যাংক হিসাব পরিচালনা, পাসপোর্ট ইস্যু সহ সব ক্ষেত্রে রাখাইন অক্ষরের সহিত প্রদানের অধিকার ফেরত দেয়া প্রভৃতি।

বস্তুত ব্যক্তিগত ও সরকারি সহযোগিতার মাধ্যমে রাখাইন ভাষা শিক্ষা ব্যবস্থা চালু থাকলে একদিকে যেমন রাখাইনরা নিজেদের স্বকীয়তা খুঁজে পাবে তেমনি অন্যদিকে তাদের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যও সুরক্ষিত হবে। মানুষের জীবনে জন্ম, মৃত্যু, বিয়ে এই তিনটি বিষয় ক্রান্তিকালীন পর্ব হিসেবে স্বীকৃত। রাখাইনরাও এর ব্যতিক্রম নয়।

ক্রান্তিকালীন পর্ব

সন্তান প্রসবে নিজগৃহে দাই/ধাত্রীর পরিবর্তে চিকিৎসা ও ক্লিনিকের শরণাপন্ন হচ্ছে। এক সময় সন্তান প্রসব নিয়ে তাদের মধ্যে শুচি অশূচির যে ধারণা ছিল বর্তমানে তা লক্ষ করা যায় না। নবজাতকের আগমনে ভোজ উৎসবের প্রয়োজন অনেক কমে গেলেও বৌদ্ধ বিহারে খাদ্যদ্রব্য প্রদানের রীতি প্রচলিত আছে। কোনো রাখাইন শিশু জন্মের ৫ বছরের মধ্যে মারা গেলে মৃত্যুর দিন শ্মশানে বা বৌদ্ধ বিহারে দাফনের মাধ্যমে সৎকার করা হয় এবং বড়দের ক্ষেত্রে মৃত্যুর দিন সৎকার না করে সাধারণত পরের দিন সৎকার করা হয়। অন্যদিকে ধর্মীয় পুরোহিতদের ১ মাস থেকে ১ বছর পর বিভিন্ন আচারাদি পালন, নৃত্য, গান এসবের মধ্য দিয়ে সৎকার করা হয়। কালের বিবর্তনে ক্ষমতাধর ও বিত্তবান প্রতিবেশি ও ভূমি দখলকারীর কারণে রাখাইনদের মৃত্যুর পর সর্বশেষ আশ্রয় স্থল শ্মশান এখন নিরাপদ নয়। কক্সবাজার বিমান বন্দরের সন্নিকটে অবস্থিত কেন্দ্রীয় শ্মশানটিতে একসময় নির্বিঘ্নে সৎকার করা গেলেও অবৈধ দখলের কারণে বর্তমানে শ্মশান ভূমি ক্রমশ ছোট হয়ে আসছে।

বিবাহ উৎসব

রাখাইন সমাজে নিজ গোত্রে বিয়েকে উৎসাহিত করা হলেও ভিন্ন গোত্রে বিয়েকে নিরূৎসাহিত করা হয়। কিন্তু বর্তমানে ছেলেমেয়েদের বহির্গমনের সুযোগে প্রণয়ঘটিত কারণে ভিন্ন গোত্রে বিয়ে লক্ষ করা যায়, আবার অনেক রাখাইন নারী আর্থিক দৈন্যতার কারণেও বাঙালিদের বিয়ে করে। এ ধরনের বিবাহিতদের প্রথমদিকে সমাজচ্যুত করা হলেও পরবর্তীতে মেনে নেয়ার উদাহরণও রয়েছে। অনেক সময় লোকচক্ষুর অন্তরালে আবার অনেক সময় প্রকাশ্যে হয়ে থাকে।

কেস স্টাডি-২: উছিংরাই (ছদ্ম নাম) নামক এনজিও কর্মী কর্মসূত্রে পরিচিত 'বড়ুয়া' সম্প্রদায়ের ছেলেকে প্রেম করে বিয়ে করলে শাস্তি স্বরূপ তার মা বাবাকে এক ঘরে করে রাখা হয় এবং সমাজ

থেকে তাদের তাড়িয়ে দেয়া হয়। উক্ত পরিবারের কোনো সদস্যের সাথে পথে দেখা হলে গাল মন্দ শুনতে হত। স্কুলে যাবার পথে তার ছোট বোনটি পাড়ার মহিলাদের নির্যাতনের শিকার হত। বড়ুয়া সম্প্রদায় তাদেরই জাতি গোষ্ঠীর লোক হওয়ায় পরিবারবর্গ মেনে নিলেও প্রতিবেশীরা এখনও তাকে হেয় প্রতিপন্ন করে 'রাজ বংশধর' বলে। প্রথম দিকে মা বাবার সাথে লুকিয়ে দেখা করলেও বর্তমানে অবশ্য সকলের সামনেই দেখা করতে পারে। অনেকে পাত্র-পাত্রীর স্বল্পতার কারণেও ভিন্ন গোত্রে বিয়েকে অযৌক্তিক ও অমঙ্গল ভাবে না। এজন্য দেশের অভ্যন্তরে রাখাইন ও মারমা সন্তানদের মধ্যে যেমন বিয়ে পরিলক্ষিত হয়, তেমনি দেশের বাইরে মায়ানমার ও ভারতে অবস্থানরত রাখাইন ও মারমাদের মাঝেও এ ধরনের বিয়ে পরিলক্ষিত হয়। পূর্বে রাখাইন সমাজে সাধারণত কনের বাড়িতে ঠাকুরের সাহায্যে বিয়ে সম্পন্ন হলেও বর্তমানে আধুনিকতা ও বাঙালি সংস্কৃতির প্রভাবে কমিউনিটি সেন্টারে বিবাহ কার্য সম্পন্ন হয়। সেক্ষেত্রে তাদের পোশাক-পরিচ্ছদ, সাজসজ্জা ও খাবারের ক্ষেত্রে ব্যাপক পরিবর্তন পরিলক্ষিত হয়। আগে যেখানে স্বামীকে কনের বাড়িতে থাকতে হতো বর্তমানে খুব কম সংখ্যা নারী-পুরুষ তা পছন্দ করে।

কেস স্টাডি-৩: প্রসুন নামের স্বর্ণ ব্যবসায়ী বলেন, আগে ঘরজামাই হিসেবে স্ত্রীর বাবার বাড়িতে থাকার প্রচলন থাকলেও বর্তমানে তার প্রচলন খুব কম। তবে স্ত্রীর বাবা মার একমাত্র সন্তান হলে সেক্ষেত্রে ব্যতিক্রম। কনের বাড়িতে বসবাসের কারণে ঘর জামাইয়ের অবস্থা বাঙালি সমাজের মতো অবমাননাকর ও নাজুক নয়। বরং এটি প্রথায় পরিণত হয়েছে যে, ন্যায্য অধিকারেই স্বামী স্ত্রীর গৃহে সংস্থান করে নেয়। অধিকাংশ ক্ষেত্রে স্বামী শ্বশুরালয়ে পৃথক ঘরে ও পৃথক অন্নে স্ত্রীকে নিয়ে দাম্পত্য জীবনযাপন করে। স্বামী স্ত্রীতে ভাল বনিবনা থাকলে কাজের সুবিধার্থে বাবা মায়ের অনুমতি নিয়ে আলাদা বাড়িতে থাকতে পারে। প্রসুন নিজেও দোকানের পাশে নিজ পরিবার নিয়ে থাকে। তবে বিবাহ সহ যেকোনো সামাজিক ও ধমীয় অনুষ্ঠানে তাদের নিজস্ব সংস্কৃতির চর্চা এখনও বেশ জনপ্রিয় এবং গ্রহণযোগ্য।

সংস্কৃতি চর্চা

রাখাইন সংগীতে বিভিন্ন ধারা লক্ষ করা যায়। বর্তমানে মূল শাস্ত্রীয় ধারার সংগীত চর্চার প্রচলন নেই। রাখাইনদের জীবনযাপনে এবং সকল সামাজিক আচার-অনুষ্ঠানে নৃত্য একটি অবিচ্ছেদ্য অংশ। কক্সবাজারে বড় কোনো অনুষ্ঠান হলে তাদের অংশগ্রহণ অনুষ্ঠানটির শোভা অনেক বেশি বর্ধন করে। মাঠ গবেষণায় জানা গেছে, বর্তমানে আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত প্রজন্মের কাছে নিজের সংস্কৃতির বিষয়গুলো খুব একটা গুরুত্ব বহন করে না।

কেইস স্টাডি-৪: সংস্কৃতি কর্মী নাইনেছা বলেন, রাখাইনদের ঐতিহ্যবাহী সংস্কৃতি চর্চা ধরে রাখার উদ্যোগ নেই বললেই চলে। সংস্কৃতি বিস্তারের লক্ষ্যে স্বতন্ত্র 'রাখাইন সাংস্কৃতিক ইনষ্টিটিউট' এর দাবী অনেক দিনের পুরনো হলেও তা উপেক্ষিত রয়ে গেছে। রাখাইন সাংস্কৃতিক কেন্দ্র স্থাপন করা হলে তরূণ প্রজন্মের প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার পাশাপাশি নিজের সংস্কৃতি চর্চাও অব্যাহত রাখা হবে। কিন্তু এ ধরনের প্রতিষ্ঠান না থাকার কারণে তারা দিন দিন টিভি চ্যানেলগুলোর দিকে বেশি আগ্রহী হয়ে উঠছে। সরকারি সহযোগিতা ও উদ্যোগ থাকলে নিজ সংস্কৃতিকে রক্ষা করা যাবে বলে তারা মনে করে। এতে শুধু রাখাইন সম্প্রদায়ের ঐতিহ্য ও সংস্কৃতি বিলুপ্তির হাত থেকে রক্ষা পাবে না অধিকন্তু কক্সবাজার শহরের সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডল সমৃদ্ধ হওয়ার পাশাপাশি বিকশিত হবে। এছাড়া কক্সবাজারের পর্যটন

শিল্প থেকে কক্সবাজারের সকল অধিবাসী উপকৃত হবে। রাখাইন সংস্কৃতিকে টিকিয়ে রাখার জন্য Rakhaine Buddhist Welfare Associationপ্রতি বছর রেডিও টেলিভিশনে বিভিন্ন প্রোগ্রাম প্রচারের পাশাপাশি বিভিন্ন দিবসে নানা ধরনের অনুষ্ঠান প্রচারের ব্যবস্থা করে প্রশংসার দাবী রাখে। তাই বলা যায়, কিছুটা পরিবর্তন সাধিত হলেও ধর্মীয় অনুষ্ঠানগুলো বেশ আয়োজন করেই পালন করা হয়।

ধর্মীয় আচার অনুষ্ঠান

বাংলাদেশের রাখাইনরা হনিযান অর্থাৎ থেরবাদী বৌদ্ধ ধর্মালম্বীরা বিভিন্ন ধমীর্য় উৎসব যেমন বুদ্ধ পূর্ণিমা (ঞ্চং রিলং পোওয়ে), প্রবারনা পূর্ণিমা (ওয়া গ্যে লাব্রে), কঠিন চীবর দানোৎসব (কাঠিং ছাং ঘ্রেংঃ হ্লু পোত্তয়ে), রাথোৎসব (রাথাঃ পোওয়ে) ইত্যাদি পালন করে। এসব অনুষ্ঠানে ধমীর্য় রীতি নীতি যেমন পুস্প, জল, আহার, প্রদীপ পূজা, দান, ভিক্ষুদের পিন্ড-দান প্রভৃতি লালন করা হলেও বর্তমানে নানা কারণে উৎসবের জৌলুস কমে যাচ্ছে। ধর্মকে এখন তারা নিজেদের মতো করেই ব্যবহার করছে। যার কারণে ব্যাপক পরিবর্তন পরিলক্ষিত হয়। যেমন কঠিন চীবর ছাড়াও ভিক্ষুর পরিধেয় অন্যান্য পোশাক, বই-পুস্তক, কলম, পেন্সিলসহ নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি দান করা হতো। রাখাইন মহিলারা নিজেদের তাঁতের সাহায্যে পুরোহিতদের জন্য চীবর ১দিনে তৈরি করত কিন্তু বর্তমানে সময় স্বল্পতা ও দ্রব্যমূল্যের উর্ধ্বগতির কারণে এধরনের চীবর ও অন্যান্য জিনিসপত্র প্রতিবেশী রাষ্ট্র মায়ানমার থেকে আমদানি করা হয়। এই পরিবর্তন সম্পর্কে কেস স্টাডিতে ধারনা দেয়া হলো।

কেস স্টাডি-৫ঃ মাথে (ছদ্ম নাম) বলেন, তাদের আচার-অনুষ্ঠানগুলোতে ব্যাপক পরিবর্তন ঘটেছে যেমন-আগে তারা বিভিন্ন উৎসবে মাংস, শ্রমণ দিয়ে পাড়া শুদ্ধ খাওয়াত, দ্রব্য মূল্যের উর্ধ্বগতির কারণে বর্তমানে তা কমে গেছে। অনেক ক্ষেত্রে অনুষ্ঠান করা হলেও চোখে পড়ার মতো নয়। শিক্ষা, চাকুরী সহ নানা ব্যস্ততার কারণে অনেকে ইচ্ছাকৃতভাবে এসব অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করে না। এছাড়া পরিবেশও এক্ষেত্রে বড় ফ্যাক্টর হিসেবে কাজ করে। মসজিদের পাশে মন্দিরের অবস্থানের কারণে উৎসব, অনুষ্ঠান পালন করতে পারে না। কেননা এসব অনুষ্ঠান পালনের সময় নানাবিধ সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও মানসিক চাপের সম্মুখীন হতে হয়। প্রশাসনের সহযোগিতার অভাব ছাড়াও বাঙালি সংস্কৃতি সংমিশ্রণের কারণে ঐতিহ্যগত অনেক কিছু বাদ দিয়ে উৎসব অনুষ্ঠান চালিয়ে আসছে, যা প্রজন্মান্তরে বিলুপ্ত হয়ে গিয়েছে। ফলে তাদের ধর্মীয় আচার অনুষ্ঠানে দেখা যাচ্ছে ব্যাপক পরিবর্তন।

রাজনৈতিক পরিবর্তন

রাজনৈতিক পরিবর্তনও রাখাইনদের জীবনের একটি অবিচ্ছেদ্য অংশ যা তাদের জীবন ও জীবিকায় প্রভাব ফেলে। অধিকাংশ রাখাইনের মতে, তাদের রাজনৈতিক অবস্থান এমন অসম্মানজনক যে, যা তাদেরকে দ্বিতীয় শ্রেণীর নাগরিকে পরিণত করেছে। বাংলাদেশ সংবিধানের ৩নং ধারায় বাংলা ভাষাকে রাষ্ট্রভাষা রূপে ঘোষণাকরণ উপেক্ষার একটি নগণ্য উদাহরণ হলেও একসময় শুধু বাঙালি বলে বাংলাদেশের জাতীয় পরিচয় ঘোষণার এবং ধর্ম নিরপেক্ষতার স্থলে ইসলাম ধর্মকে রাষ্ট্রীয় ভাবে চাপিয়ে দেয়া সকল বাঙালি মুসলিম জাতি কর্তৃক রাখাইনদের মতো অন্যান্যদের অবমাননা করার সমতূল্য। সংবিধানের ১৪ ও ২৮ ধারায় অনগ্রসর সম্প্রদায়েরজন্য কিছু সুযোগ-সুবিধা প্রদানের কথা উল্লেখ থাকলেও রাখাইন সম্প্রদায়ের মধ্যে উঁচু মানের রাজনীতিবিদ না থাকায় সরকার কর্তৃক প্রদেয় এ

ধরনের সুযোগ-সুবিধা প্রাপ্তিতে প্রতিবন্ধকতার সম্মুখীন হতে হয়। তাদের সম্প্রদায়ের অন্যতম ব্যক্তিত্ব অধ্যাপক এথিন রাখাইন ৫ বছরের জন্য মহান জাতীয় সংসদে মহিলা সংসদ হিসেবে নির্বাচিত ছিলেন। এখনও তিনি রাজনীতির সাথে সম্পৃক্ত থেকে অনগ্রসর সম্প্রদায়ের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে ভূমিকা রাখার পাশাপাশি বিভিন্ন ধর্মীয় ও সামাজিক প্রতিষ্ঠানকে সাধ্যমত সহযোগিতা করছেন।

ভূমি সংকট ও অর্থনৈতিক অনিশ্চয়তা

রাখাইনদের অর্থনৈতিক অবকাঠামো স্বাতন্ত্র্য বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত। সামগ্রীকভাবে বাঙালিদের চেয়ে পিছিয়ে থাকলেও প্রতিকূল পরিবেশেও নিজেদেরকে স্বাবলম্বী হিসেবে গড়ে তোলা ও অর্থনৈতিক ভাবে এগিয়ে যাওয়ার ক্ষেত্রে তাদের সংগ্রামী মনোভাব প্রশংসার দাবিদার। গ্রামাঞ্চলে রাখাইনদের অস্তিত্বের প্রথম ও প্রধান শর্ত হলো ভূমি, যা তাদের অর্থনীতি নির্ধারণ করছে। কিন্তু বিত্তবান ও ভূমি খেকোদের প্রবল গ্রাসে তাদের জমি বেদখল হয়ে যাচ্ছে। ভূমি সমস্যার কয়েকটি উল্লেখযোগ্য দিক হলো:

১. ভূয়া নিলাম ও মিথ্যা রেকর্ডের মাধ্যমে ভূমি দখল;

২. রাখাইন এলাকার খাস জমি, তাদের না জানিয়ে বাঙালিদের বন্দোবস্ত দেয়া হচ্ছে;

৩. খাস জমি, হলট, নালা ইত্যাদি গণ ব্যবহার্য জমি বাঙালিরা জবরদখল করছে এবং স্থানীয় প্রশাসনের যোগসাজসে বন্দোবস্ত গ্রহণ করছে;

৪. ভুমিহীনদের খাস জমি বিতরণের ক্ষেত্রে ভূমিহীন রাখাইনরা কোনোরূপ পুনর্বাসন লাভ করছে না এবং প্রভাবশালী বাঙালিরা বেনামে নিজেদের ভূমিহীন পরিচয় দিয়ে মিথ্যের আশ্রয় নিয়ে খাসজমি গ্রহণ করছে এবং অনেক ক্ষেত্রে বাঙালিদের কেউ কেউ একাই বহু খাস জমি ভোগ দখল করছে।

বৃটিশ আমলের পরবর্তী সময় হতে বর্তমান অবধি রাখাইনদের মধ্যে এই ভূমি সমস্যা বিরাজমান। বাঙালি জনসংখ্যা দ্রুত বৃদ্ধির ফলে বাসস্থানজনিত সমস্যা ভূমি-লোভ, ক্ষমতার অপব্যবহার এক্ষেত্রে অনেকাংশ দায়ী বলে রাখাইনরা মনে করে।

কেস স্টাডি-৬: সাজু রাখাইন, পেশায় ব্যবসায়ী। মুক্তিযুদ্ধের সময় তার বাবা কক্সবাজার পৌরসভায় কর্মরত ছিলেন। সে সময় প্রাণ ভয়ে অন্যান্য রাখাইনদের সাথে তিনিও চলে গিয়েছিলেন বাঙালি এক পরিবারের কাছে জমি বিক্রী করে। যুদ্ধ শেষে দেশে ফিরে ঐ ব্যক্তি থেকে পুনরায় জমিগুলো কিনে নেন। উভয়ের মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক ভাল থাকায় দলিল প্রত্রাদি করার প্রয়োজন মনে করেননি। দু'জনের কেউ বর্তমানে জীবিত না থাকায় ঐ বাঙালি ব্যক্তির সন্তানেরা তাদের পিতার জায়গাগুলো মসজিদের নামে দানপত্র করে গেছে বলে হাতিয়ে নিতে চাচ্ছে। এছাড়াও বর্তমানে কক্সবাজার ফায়ার সার্ভিসের সামনে মার্কেটের জায়গাগুলো মুসলিমরা তার পরিবার থেকে জোর পুর্বক নিতে চাইলে কেইস করলেও জোর পূর্বক পেরে উঠতে না পারায় ন্যায্য মূল্যের অর্ধেক দামে বিক্রি করে দেয়।

এধরনের ভূমি সমস্যা তাদের মধ্যে প্রতিনিয়ত হচ্ছে। সদর এলাকায় তা চুপিসারে হলেও শিক্ষা বর্জিত এলাকাগুলোতে অনেক বড় আকার ধারণ করে। এ সমস্যা শুধুমাত্র বাঙালি রাখাইনদের মধ্যে নয়, বরং তাদের নিজেদের মধ্যেও প্রকট। ভূমি আত্মসাৎ প্রক্রিয়ার ফলে রাখাইনদেরকে ভূমিহীনতা বরণ করতে হচ্ছে। বর্তমানে কক্সবাজারের গ্রামাঞ্চলে রাখাইনদের মধ্যে ৩৩ শতাংশের বেশি পরিবার ভূমিহীন এবং প্রান্তিক কৃষক ২০ শতাংশ।

৬। রাখাইনদের জীবিকা

রাখাইনদের ঐতিহ্যবাহী পেশাগুলোয় দৃষ্টি দিলে অর্থনেতিক অবস্থান সম্পর্কে ধারণা পাওয়া যায় যা সমাজ কাঠামোর মূল ভিত্তি এবং বেঁচে থাকার অনুপ্রেরণা। কিন্তু কালের প্রেক্ষিতে ঐতিহ্যবাহী পেশাগুলোতে নানামুখী সমস্যার কারণে তারা অন্য পেশায় ধাবিত হচ্ছে। এতে ঐতিহ্যবাহী পেশাগুলোর পাশাপাশি নতুন নতুন ক্ষেত্র তৈরি হওয়ায় পেশার গতিশীলতা বৃদ্ধি পাচ্ছে। ফলস্বরূপ তাদের জীবনমানের উন্নয়নের পাশাপাশি চাহিদারও ব্যাপক পরিবর্তন সূচিত হচ্ছে। নিম্নে তাদের পেশা সম্পর্কে আলোচনা করা হলো।

তাঁত বোনা

ঐতিহ্যবাহী পেশা তাঁত বোনা পর্যটকদের অন্যতম আকর্ষণ এবং বৈদেশিক মুদ্রার উৎসও বটে। বর্তমানে সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক কারণে এ শিল্প বিলুপ্তির সম্মুখীন হলেও বাংলাদেশ তাঁত উন্নয়ন বোর্ডের বহুমুখী উদ্যোগের ফলে অনেকেই এ পেশায় আগ্রহ দেখাচ্ছে। তবে বর্তমানে রাখাইনরা স্বীয় ঐতিহ্য ধরে রাখার পাশাপাশি স্বচ্ছল ভাবে বেঁচে থাকার জন্য তাঁত শিল্পকে একমাত্র পেশা হিসেবে গ্রহণ না করে যুগোপযোগী অন্যান্য পেশার সাথেও সম্পৃক্ত হচ্ছে। এক্ষেত্রে পুরুষের পাশাপাশি নারীর অবদানও কম নয়। কেননা রাখাইন সমাজে প্রায় সব ধরনের অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে মহিলাদের অংশগ্রহণ রয়েছে।

কেস স্টাডি-৭: খিন মে বলেন, কক্সবাজার সদরে ঘরোয়া পরিবেশে কাজ করলেও এখনও মহেশখালী বড় রাখাইন পাড়ায় তাঁত শিল্পের কারখানা রয়েছে। নারীরা বিভিন্ন রকমের শাল, বেডসিট, গজ কাপড়, ফতুয়া তৈরি করে। একজন দক্ষ নারী দিনে ৫-৬ গজ কাপড় বুনতে পারে। একটা সময় রাখাইন নারীদের তাঁত বুনতে জানা বাধ্যতামূলক ছিল। তাঁত বুনন জানে না এমন তথ্য পাত্রপক্ষ কোনোভাবে অবগত হলে পাকাপোক্ত বিয়ের আলোচনা মাঝপথে থেমে গিয়েছে এমন ঘটনাও ঘটেছে। এজন্য পরিবারের অগ্রজদের কাছ থেকে তাঁত বুনন শেখা বাধ্যতামূলক ছিল বিধায় প্রতিটি নারীই ছিল এক একজন সুনিপুণ তাঁতী।"একজন তাঁতীর শবদেহ জ্বালানি কাঠ ব্যতীত কেবলমাত্র তার তাঁতের সরঞ্জামাদি দিয়ে সৎকার করা সম্ভব''। এ প্রবাদটি এখনো রাখাইন সমাজে প্রচলিত রয়েছে।

বার্মিজ পণ্যসামগ্রী, সেলস গার্ল

নারী উদ্যোক্তা দ: উমে সর্বপ্রথম রাখাইন হস্তশিল্পের দোকান দিয়ে পর্যটকদের মনোযোগ আকর্ষণ করতে সক্ষম হন। পরবর্তীতে এই দোকান মার্কেটে পরিণত হয়, যা তাকে এনে দেয় 'শ্রেষ্ঠ মহিলা

উদ্যোক্তা' পদক, যা অন্যদের জন্য অনুপ্রেরণীয়। কক্সবাজারে এই দোকান ব্যবসায় এখনও পর্যন্ত নারীদের অংশগ্রহণ বেশি। রাখাইনদের এই কর্মময় জীবন সম্পর্কে অনেকে একই ধারণা পোষণ করেন। এ প্রেক্ষিতে দোকান ব্যবসায়ী লালাজেন বলেন, অন্যান্য সম্প্রদায়ের চেয়ে রাখাইনদের মধ্যে কর্মজীবি মহিলার সংখ্যা বেশি। রাখাইন নারীরা যেমন কষ্ট সহিষ্ণু তেমনি পরিশ্রমী। এছাড়া সংসারে অন্যের উপর নির্ভরশীল থাকতে পছন্দ করে না বরং নিজ পায়ে দাঁড়াতে আগ্রহী। তাছাড়া এ ধরনের অনেক নারী ব্যবসায়িক ভাবে সফল এবং তাদের জন্য আদর্শ হওয়ায় কাজ করতে বেগ পেতে হয় না। পরিবারের পুরুষ সদস্যেরও পূর্ণ সমর্থন থাকে, অনেক ক্ষেত্রে পুরুষের তুলনায় আয় বেশি এবং পরিবারের একটি বড় ভার মহিলারা নেয় বলে অনেকের ধারনা রাখাইন সমাজ মাতৃসূত্রীয়। কিন্তু মাঠ কর্মের মাধ্যমে জানা যায়, রাখাইন সমাজ পিতৃসূত্রীয় এবং মারমাদের সমাজ মাতৃসূত্রীয়। তবে সে ক্ষেত্রে বাবার ভূমিকা ও কোনো অংশে কম মর্যাদার নয়।

শুটকি প্রক্রিয়াজাতকরণ এবং নাপ্পি তৈরি

বাংলাদেশে উৎপাদিত শুটকির এক বিরাট অংশ উৎপাদিত হয় কক্সবাজারে। অতীতে দরিদ্র শ্রেণী এ পেশার সাথে জড়িত হলেও বর্তমানে বাণিজ্যিকভাবে উৎপাদিত হওয়ায় ধনী-দরিদ্র সকলেই এ পেশার সাথে জড়িত। বাঙালিদের পাশাপাশি রাখাইন নারী-পুরুষরাও এ পেশার সাথে জড়িত থাকলেও নাপ্পি তৈরিতে রাখাইন নারীদের একচ্ছত্র আধিপত্য রয়েছে। সবচেয়ে বেশি নাপ্পি তৈরি হয় মহেশখালীর বড় রাখাইন পাড়ায়। কেউ মাছ শুকিয়ে নাপ্পি তৈরির উপযোগী করে, কেউ ছোট চিংড়ী নিয়ে আসে, কেউবা ময়লা বাছাই করে।

অন্যান্য পেশা

রাখাইনদের একটি অন্যতম ঐতিহ্যবাহী পেশা হলো স্বর্ণ ব্যবসা। অতীতে অধিকাংশ রাখাইন পুরুষ স্বর্ণ ব্যবসার সাথে জড়িত থাকলেও প্রতিকূল পরিবেশের কারণে তারা মহাজনী পেশার দিকে ঝুঁকে পড়ছে। ১৯৪০ সালের The Bengal Money Lender's Act অনুযায়ী, জেলা প্রশাসক থেকে ব্যবসার লাইসেন্স নিতে হয়। রাখাইন মহাজনদের থেকে টাকা নিয়ে অনেকে নানাভাবে উপকৃত হলেও এ পেশা ঝুঁকিমুক্ত নয়। তাই এ পেশার পাশাপাশি অন্য ব্যবসার সাথে জড়িত হলে শুরু হয় পেশাগত প্রতিযোগিতা। বাঙালি দখলদারিত্বের জন্য অনেক পেশায় তারা সুদৃঢ় অবস্থান ধরে রাখতে পারছে না। আবার বাঙালি কর্তৃক অনেক বিধিনিষেধও আরোপ করা হয়। যেমন রাখাইনদের জন্য বাজারে বড় মাছ বিক্রী নিষিদ্ধ। কোনো রাখাইন বড় মাছ বিক্রী করতে চাইলে তাকে সেখান থেকে উঠিয়ে দেয়া হয়। দ্রব্যসামগ্রী বিক্রীর ক্ষেত্রে দেখা যায়, বাঙালি বিক্রেতারা যে দামে দ্রব্য সামগ্রী বিক্রয় করে, রাখাইনরা সে দামে বিক্রী করতে পারে না । ফলস্বরূপ প্রকৃত মূল্যের অর্ধেক দামও পায় না। পেশাগত প্রতিযোগিতা থাকা সত্ত্বেও তাদের কেউই অভাবের তাড়নায় ভিক্ষা বৃত্তির সাথে জড়িত নয়। সেক্ষেত্রে জীবিকার তাগিদে নিজেদের চেষ্টার ত্রুটি থাকে না। উল্লেখ্য, কক্সবাজার শহরের মাছ বাজারের পঙ্গু কহ্লোচিং নিজস্ব নৌকায় জাল ফেলে মৎস্য আহরণ ছাড়াও মাছ বিক্রী, ঝিনুক-কাকঁড়া শিকার করে জীবিকা নির্বাহ করে থাকেন।

পেশাভেদে রাখাইনদের শতকরা হার নিম্নরূপ:

পেশা	শতকরা হার(%)
কারিগরি/ব্যবসা (ঝিনুক সংগ্রহ ও পণ্য বাজারজাতকরণ, পার্লার ব্যবসা, বাঁশ সংগ্রহ ও প্রস্তুত কৌশল, টেইলারিং)	৭০%
তাঁতী	১০%
চাকুরীজীবি	১০%
শিক্ষকতা	০২%
কৃষিজীবি	০২%
মৎস্যজীবি	০২%
অন্যান্য	৪%
মোট	১০০%

উৎস: মাঠকর্ম হতে প্রাপ্ত তথ্যানুসারে।

৭। উপসংহার

নিজস্ব নিয়মকানুন, আচার আচরণ ও সাহিত্য সংস্কৃতি ধারন ও লালন-পালন ইত্যাদি দিক দিয়ে সংস্কৃতিগত পার্থক্য থাকা সত্ত্বেও বাঙালিদের সাথে সহাবস্থান করছে। এ প্রবন্ধে রাখাইন সম্প্রদায়ের জীবন ও জীবিকা অর্থাৎ তাদের অভিবাসনের প্রেক্ষাপট, দৈনন্দিন জীবনের সংস্কৃতি ও বৈচিত্র্যপূর্ণ পেশা সম্পর্কে আলোকপাত করা হয়েছে। মাঠ গবেষণা হতে প্রাপ্ত তথ্য-উপাত্ত পর্যালোচনায় দেখা যায়, প্রতিকূল পরিস্থিতির মধ্যে থেকে নিজস্ব সংস্কৃতির গণ্ডি ছেড়ে তারাও নতুন পরিবেশে খাপ খাওয়ানোর চেষ্টা করে যাচ্ছে। অন্যভাবে বলা যায়, রাখাইনরা নিজেদেরকে সম্প্রদায়গত বৃত্তে ধরে রাখছে না। ভিন্ন সংস্কৃতির প্রভাব, আবিষ্কার ও উদ্ভাবন, উন্নত তথ্য প্রযুক্তি ও শিক্ষার কারণে তাদের সচেতনতা বৃদ্ধির ফলে জীবনযাত্রার গুণগত মান বৃদ্ধি পাচ্ছে। আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত হওয়ায় বর্তমান প্রজন্ম নিজেদের অবস্থানকে সুদৃঢ় করে নিচ্ছে। এর প্রভাব তাদের দৈনন্দিন জীবনের (যেমন আবাস স্থল, খাদ্যভাস, পোশাক-পরিচ্ছেদ, মূল্যবোধ ও মনোবৃত্তি, ভাষা ও শিক্ষার ক্ষেত্রে) পাশাপাশি সামাজিক ও সাংস্কৃতিক (যেমন জন্ম-মৃত্যু, বিবাহ, সঙ্গীত ও নৃত্যকলা, খেলাধুলা, অর্থনৈতিক (পেশা পরিবর্তন) প্রক্রিয়ায়ও পড়ছে। তাছাড়া বর্তমানে এ তরুন প্রজন্মের অভিভাবকরা শিক্ষিত, সচেতন ও উন্নত মানসিকতা সম্পন্ন হওয়ার কারণে নিজেদের ঐতিহ্য ধরে রাখার জন্য চেষ্টা করে চলেছে। বিভিন্ন সংগঠনও এক্ষেত্রে সহযোগিতা করে চলেছে। তরুণ প্রজন্মও পিছিয়ে নেয়। কেননা তারা নিজেদের উদ্যোগে বিভিন্ন সংগঠনের লুপ্তপ্রায় বিভিন্ন ঐতিহ্যগত জিনিসকে জাদুঘর নির্মাণের মাধ্যমে সংরক্ষণের চেষ্টা করছে, যা ভবিষ্যত প্রজন্মের জন্য উপহার স্বরূপ কেননা এর মাধ্যমে তারা নিজেদের ঐতিহ্যগত অবস্থান সম্পর্কে ভালভাবে জানতে পারবে।

বস্তুত একটি দেশের উন্নয়ন তখন সম্ভব হয়, যখন দেশের প্রতিটি জনগোষ্ঠীর মধ্যে সমভাবে এ ধারা প্রভাবিত হয়। তাই প্রকৃত সঠিক কল্যাণ ও উন্নয়নের জন্য নিজেদের এ সকল উদ্যোগের পাশাপাশি প্রয়োজন সরকার ও রাষ্ট্রের পৃষ্ঠপোষকতা এবং ন্যায় বিচার। এক্ষেত্রে চিহ্নিত প্রতিবন্ধকতাসমূহ দূরীকরণে যথোপযুক্ত ব্যবস্থা নেওয়া হলে রাখাইন সম্প্রদায় সহ অন্যান্য অনেক গোষ্ঠী যেমন সুন্দরভাবে বেঁচে থাকার স্বাচ্ছন্দ্যটুকু পাবে তেমনি সমৃদ্ধ বাংলাদেশ গড়ার অগ্রযাত্রায়ও তারা কার্যকর ভূমিকা রাখতে সক্ষম হবে। রাখাইন সম্প্রদায়ের অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য রাষ্ট্র ও সরকারের পৃষ্ঠপোষকতায় নিম্নলিখিত পদক্ষেপগুলো গ্রহণ করা যেতে পারে:

- যেহেতু বাংলাদেশে ভূমিই অস্তিত্বের প্রথম শর্ত (Mustafa and Khan 1984: 8) সেহেতু ভূমির উপর রাখাইনদের অধিকারের নিশ্চয়তা প্রদান;
- রাখাইনদের মালিকানাধীন জমিগুলো সুষ্ঠু তদন্ত সাপেক্ষে বিক্রয় ও হস্তান্তরের ব্যবস্থা করা;
- ভাষাগত বাধা দূরীকরণের জন্য ব্যবস্থা গ্রহণ। যে সমস্ত বিদ্যালয়ে ন্যূনতম ১৫-২০ জন রাখাইন শিক্ষার্থী আছে, সে সমস্ত বিদ্যালয়ে রাখাইন ভাষা শিক্ষার ব্যবস্থা নেয়া কিংবা রাখাইন শিক্ষকের মাধ্যমে ভাষা শিক্ষা প্রদান;
- সংস্কৃতি বিস্তারের লক্ষ্যে স্বতন্ত্র 'রাখাইন সাংস্কৃতিক ইনস্টিটিউট' প্রতিষ্ঠা;
- কাঁচামালের সহজ প্রাপ্যতা এবং নির্বিঘ্নে আনা নেয়ার ব্যবস্থা গ্রহণ;
- ঐতিহ্যবাহী শিল্পগুলোতে উৎপাদিত পণ্যের প্রতি ভোক্তাদের আগ্রহ বাড়ানোর লক্ষ্যে পণ্যের গুণগত মান উন্নয়নের পাশাপাশি উৎপাদনের পরিমাণ বৃদ্ধির জন্য উন্নত প্রযুক্তি ব্যবহারের উপর প্রশিক্ষণ প্রদান;
- উৎপাদিত পণ্যের বিপণন সংক্রান্ত প্রতিবন্ধকতা দূরীকরণ;
- মৎস্য শিকারীদের উপর পরিচালিত ভীতিমূলক কার্যগুলো দমনের ব্যবস্থা গ্রহণ;
- নির্বিঘ্ন সৎকারের জন্য শ্মশান ভূমি থেকে অবৈধ স্থাপনা উচ্ছেদ।

গ্রন্থপঞ্জি

আইএলও কনভেনশন (১৯৫৭): জেনেভা উদ্ধৃতি; উদ্ধৃতি: পশুপতি মাহাতো **অরণ্য ও প্রকৃতির সন্তানেরা**, দেশ, ক্রমিক সংখ্যা ১০৭, ৫৬ বর্ষ, ১৫ সংখ্যা, কলিকাতা।

উচনু (উবা). (১৯৯১):*আরাকান পটভূমি ও রাজনৈতিক চেতনার উন্মেষ*, কর্ণফুলীর দেশ।

খান, আব্দুল মাবুদ (১৯৭৮): "আরাকানে মুসলমান সম্প্রদায়", দৌলতকাজী, সত্যেন্দ্রনাথ ঘোষাল সম্পাদিত, *সতীময়না লোর চন্দ্রানী*, বিশ্ব ভারতী, কলিকাতা।

খান, আব্দুল মাবুদ (২০০৩): "পটুয়াখালী জেলার বৌদ্ধ সম্প্রদায়", মজিদ, মুস্তফা কর্তৃক সম্পাদিত গ্রন্থ *আদিবাসী রাখাইন*, ঢাকা: মওলা ব্রাদার্স, ৩৯ বাংলা বাজার।

খান, আবদুল মাবুদ (১৯৮৩):*পটুয়খালী জেলার বৌদ্ধ সম্প্রদায়, CLIO,* a Journal of History।

মংবা (২০০৩):*বাংলাদেশের রাখাইন সম্প্রদায়: ইতিহাস, ঐতিহ্য ও জীবনধারা*, চট্টগ্রাম: ময়নামতি আর্ট প্রেস।

মংবা (২০১১): *কক্সবাজার ও রাখাইন জাতি*, চট্টগ্রাম: ময়নামতি আর্ট প্রেস।

মংবা (২০১৩). *রাখাইন রাজাওয়ান*, চট্টগ্রাম: ময়নামতি আর্ট প্রেস।

মজিদ, মুস্তফা (২০০৩):*বাংলাদেশের রাখাইন*,ঢাকা: বাংলা একাডেমী।

হাসান, মঈদুল (২০১৭):*মূলধারা ৭১*, দি ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড (ইউ পি এল

Bangladesh District Gazetters (ed.). (1975): Chittagong.

Barth, F. (1969):*Ethnic Groups and Boundaries*, USA: Little, Brown and Company.

Bessainget, P. (1958):*Tribesmen of Chittagong Hill Tracts.* Dacca: Asiatic Society of Pakistan.

Eastern Bengal District Gazetters (ed.). (1908).

Hall, D. G. E (ed). (1985):*A History of South-East Asia*, Hongkong.

Hossen, M.A. (2006):"Factors Influencing Migration Typology and Their Social Impact: A Critical Evaluation," in Islam, Z. and Shafie, H. (eds) *Anthropology on the move: Contextualizing Culture Studies in Bangladesh*, Dhaka: Dhaka University Press.

Jeck, J. C. (1918):*Bengal District Gazetteers Bakergonj*, Calcutta.

Majid, M. (2005):*The Rakhaines,* Dhaka: Mowla Brothers 39, Banglabazar.

Mohsin, A. (1997): *The Politics of Nationalism: The Case of Chittagong Hill Tracts*, Dhaka: The University Press Limited.

Mustafa, G. and A. R. Khan (1984):*Potuakhali's Rakhaines: Exiles in Their Own Kingdom*, Cover Story in Bangladesh Today, Vol.2, Issue.4, Dhaka.

Samad, M. (2006): "The Rakhaines in Bangladesh: Ethnic Origin, Life and Livelihood, Bangladesh," in Islam, Z. and Shafie, H. (eds) *Anthropology on the move: Contextualizing Culture Studies in Bangladesh*, Dhaka: Dhaka University Press.

Soedjatmoko. (1971): "Traditional Values and the Developmental Proces," *Development Digest*, January 9:1.